দুই প্রেম

বিমল কর

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
মে, ১৯৫৮

প্রকাশক:
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনিতাই চন্দ্র জানা
জয়তারা প্রেস
৩৫/সি, গোরাচাঁদ বোস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬



তৃণাঙ্কুর

এক মাস পরে আজ আবার কলকাতায় ফিরেচি। এই এক মাস দেশে কাটিয়েচি অনেককাল পরে। মা মারা যাওয়ার পরে আর এত দীর্ঘদিন একসঙ্গে দেশে কখনো থাকিনি। এই এক মাস আমার জীবনের এক অপূর্ব্ব আনন্দর অধ্যায়। Dean Inge যাকে ঠিক Joy of Life বলেচেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। সেরকম নিভৃত, শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালো-জল নদীতীর না হোলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে? শহরের কর্ম্মকোলাহলে ও লোকের ভিড়ে তার সন্ধান কোথায় মিলবে? তাই যখন জটাখালির ভাঙ্গা কাঠের পুলটাতে দুধারের মজা গাঙ ও বাঁওড় এবং মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, নীচে ঘনসবুজ গাছপালা,ধানক্ষেত, বিল, গ্রামসীমার বাঁশবন, মাটির পথের ধারে পুষ্পভারনত বাব্‌লা গাছের সারি, দূরের বটের ডালে 'বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক—এসবের মধ্যে প্রতি বৈকালে গিয়ে বসতাম, তখন মনে হত আর শহরে ফিরে যাবার আবশ্যক নেই। জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জ্জনে নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখে সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করায়। সেকথা বুঝেছিলাম সেদিন, তাই সন্ধ্যার কিছু আগে জীবনের এই অনন্ত গতি-পথের কথা ভাবতে ভাবতে অপূর্ব্ব জীবনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাহ্য না করেই কুঠির মাঠের অন্ধকার, বন নির্জ্জন ও শ্বাপদ-সঙ্কুল পথটা দিয়ে একা বাড়ি ফিরলাম। আর নদীর ধারে অপূর্ব্ব আকাশর রঙ লক্ষ্য করে তার পরদিনও ঠিক সেই মনের ভাব আবার অনুভব করেছিলাম।

এরকম এক একটা সময় আসে, যখন বিদ্যুৎচমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্ত্তে জানতে পারা যায়, বুঝতে পারা যায়। শুধু সৌন্দর্য্যই এই বিদ্যুৎ-আলোর কাজ করে মানসিক জীবনে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য বড় আপেক্ষিক বস্তু। একে সকলে চিনতে পারে না। কানকে, চোখকে, মনকে তৈরী করতে হয়, সঙ্গীতের কানের মত সৌন্দর্য্যের জ্ঞান বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে। শিমূলগাছের মাথাটার উপরকার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙ্গার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই রক্ত-মেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্ব্বতশিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে—তার ওপারে যেন জীবন-পারের বেলাভূমি! আনন্দ আবছায়ার অত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে একটু একটু চোখ পড়ে।

রোজ আমাদের বাড়ির পাশের বাঁশতলার পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাল্যের শত ঘটনা, কল্পনা আশা, দুঃখসুখের স্মৃতি মনে জেগে উঠত—এই সব বনের প্রতি গাছপালার, পথের প্রতি ধূলিকণায় যে পঁচিশ বৎসর আগের এক গ্রাম্য বালকের সহস্র সুখদুঃখ জড়ানো আছে, কেউ তা জানবে না। আর এক শত বৎসর পরে, তার ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে? কোথায় লেখা থাকবে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরের বালক জীবনে প্রথম গ্রামের উত্তরমাঠে তার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিল? কোথায় লেখা থাকবে তার মায়ের-হাতে-ভাজা তালের পিঠে খাওয়ার সে আনন্দের কাহিনী? সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘাটে স্নান করতে নেমে নতুন-ওঠা চতুর্থীর চাঁদের দিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে এইসব কথা বেশী করে মনে জাগছিল। গোপালনগরের বারোয়ারীর যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়লো যে আজ পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

সে-সব কথা যাক। অদ্ভুত এই জীবন, অপূর্ব্ব এই সৃষ্টির আনন্দ।

নির্জ্জনে বসে ভেবে দেখো, মানুষ হয়ে উঠবে।

অনেককাল পরে গরীবপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে খিনু ও তার বোন রাণীর সঙ্গে দেখা হোল। আজ প্রায় ষোল বছর আগে ওদের বাসাতে বাড়ির ছেলের মত থাকতুম। তখন আমিও বালক, ওরা নিতান্ত শিশু। সেই খিনুকে যেন আজ চিনতে পারা যায় না। এত বড় হয়ে উঠেচে, এত দেখতে সুন্দর হয়েচে। রাণীও তাই। কতক্ষণ তারা আমাকে কাছে বসিয়ে পুরনো দিনের গল্প করতে লাগলো আপনার বোনেদের মত, ছাড়তে আর কিছুতে চায় না। শেষকালে রাণী তার শ্বশুর-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে কলকাতায় গেলেই যেন সে ঠিকানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, এ অনুরোধ বার বার করলে।

এবার আরও সকলের চেয়ে ভাল লেগেচে যেদিন রামপদর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মোল্লাহাটি ছাড়িয়ে পাঁচপোতার বাঁওড়ের মুখে গিয়েছিলুম। এক তালীবনশ্যাম গ্রামরাজি। আকাশের কি নীল রঙ, ইছামতীর কি কালো জল। নৌকোতে আসবার সময় জ্যোৎস্না-রাত্রে নির্জ্জন কাশবনের ও জলের ধারের বন্যেবুড়ো গাছের ও মাথার উপরকার নক্ষত্রবিরল আকাশের কি অসীম সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত।

এই আনন্দ-দিনের ইতিহাস পাছে ভুলে যাই, তাই লিখে রেখে দিলুম। অনেককাল পরে খাতাখানা খুলে দেখতে দেখতে এইসব আনন্দের কাহিনী মনে পড়বে—তাই।

একটা কথা আজকাল নির্জ্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছ-পালা, ফুল-ফল, আলো-ছায়া আকাশ-বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অণু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এক জটিলতায়

আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না। হঠাৎ বোঝা যায় না, কিন্তু কতকগুলি প্রাথমিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে অগ্রসর হোলে আপনা-আপনি গভীর চিন্তার মুখে ধরা দেয়। এক্ষেত্রে একটা ভুল গোড়া থেকে অনেকে করেন। সেটা এই যে, পূর্ব্বের জ্ঞান মনের মধ্যে এসে পৌছলে অনেকে জ্ঞানের চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে বলেন জগৎ মিথ্যা ও মায়াময়।

বেদান্তের পরিভাষিক 'মায়া' ছাড়াও আর একটা লৌকিক বিশ্বাসের 'মায়া' আছে, যেটাকে ইংরেজীতে illusion বলে অনুবাদ করা চলবে। বেদান্তের মায়া illusion নয়, সে একটা দার্শনিক পরিভাষা মাত্র, তার অর্থ স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা লৌকিক অর্থে 'মায়া' শব্দটা গ্রহণ করেন ও অর্থগত তত্ত্বটি মনে মনে বিশ্বাস করে হৃষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁরা ভুলে যান মানুষও তো এই অসীম রহস্যভরা সৃষ্টির অন্তর্গত। তাঁর নিজের মধ্যে যে আরও অনেক বেশী সম্ভাব্যতা, অনেক বেশী আধ্যাত্মিকতা, অনেক বেশী জটিলতা, আরও বেশী রহস্য। নিজেকে দীন বলে 'মায়া' কর্তৃক প্রতারিত দুর্ব্বল জীব মনে করার মধ্যে যে কোনো সত্য নেই, এটা সাহস করে এঁরা মেনে নিতে পারেন না।

নীরদদের বাড়ি কাল সন্ধ্যার সময় বসে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলুম একখানা ইংরেজী পত্রিকাতে। এই কথাই শুধু মনে হোল আমরা জীবনে একটা এমন জিনিস পেয়েচি, যা আমাদের এক মুহূর্তে সাংসারিক শান্তিদ্বন্দ্বের ওপর এক শাশ্বত আনন্দ-জীবনের স্তরে উঠিয়ে দিতে পারে—অনন্তমুখী চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে দেয়, এক মুহূর্তে সংসারের রঙ বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। যখনই জগতের প্রকৃত রূপটির যে অংশটুকু আমরা চোখে দেখতে দেখতে যাই তা সমগ্রতার দিক থেকে আমরা দেখতে পাই, পরিপূর্ণভাবে জীবনকে আস্বাদ করবার চেষ্টা করি—ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, আকাশ, নীহারিকা, নক্ষত্র, অমরত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য্য, পদার্থতত্ত্ব, ফুল-ফল, গাছ-পালা, অপরাহ্ন, জ্যোৎস্না, ছোট ছেলেমেয়ে, প্রেম—তখনই বুঝি এই বিশ্বের সকল সৃষ্ট

পদার্থের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা ও চারিধারে আত্মাকে প্রসারিত করে দেওয়াই জীবনের বড় আনন্দ। 'আনন্দ' উপনিষদের পারিভাষিক শব্দ, লঘু অর্থে সংসারে চলে এসেচে কিন্তু আনন্দ কথার অর্থ উচ্চ জীবনানন্দ। "আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে" এখানে আনন্দের কোনো বর্ত্তমান প্রচলিত সাধারণ অর্থ নেই।

আজ খুব বেড়ানো হোল। প্রথমে গেলুম বন্ধুর ওখানে। তার মোটরে সে প্রবাসী অফিসে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সেখান থেকে গেলাম সায়েন্স কলেজে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডাঃ রায় এলেন। তিনি সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্ত্তার পর দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল, একেবারে সোজা সারকুলার রোড দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে প্রিন্সেপ্ ঘাট। বেশ আকাশের রঙটা, ক'দিন বৃষ্টির জ্বালায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল, আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, গঙ্গার ওপারে রামকৃষ্ণপুর ময়দা কলগুলোর ওপরকার আকাশটা তুঁতে রঙের, পশ্চিম আকাশে কিন্তু অস্তসূর্য্যের রঙ ফোটেনি—কেন তা জানি না। ডাঃ রায়ের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হোল—তাঁর ভারী পাকা ও যুক্তি পূর্ণ। সকাল সকাল ফিরলাম, তিনি আবার বৌবাজারের দোকানটা থেকে খাবার কিনলেন, আমায় বললেন, মাঝে মাঝে দেখা করবার জন্যে।

জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করি, তবে সেএই ডাঃ পি. সি. রায়কে। সত্যিকার মহাপুরুষ। বহু সৌভাগ্যে তবে দর্শনলাভ ঘটে, একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কইবার পরে মনে হয় যে সত্যিই কিছু নিয়ে ফিরচি।

আজ প্রবাসীতে গিয়ে বইটার* প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েচে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয়

* পথের পাঁচালী।

দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু কাল থাকবেন বলেচেন।

সেখান থেকে গেলুম দক্ষিণাবাবুর গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণে কালীঘাটে। সুরেশানন্দের ছোট একবছরের খোকাটি কি সুন্দর হয়েচে! ওকে কোলে নিয়ে চাঁদ দেখালুম—ভারী তৃপ্তি হোল তাতে। এরা সব কোথা থেকে আসে? কোন্ মহান্ আর্টিস্টের সৃষ্টি এরা? অনন্ত আকাশে কালপুরুষের জ্যোতির্ময় অনল জ্বলতে দেখেচি, পূর্ব্ব দিক্‌পালের আগুন-অক্ষরে সঙ্কেত দেখেচি, কিন্তু সে রুদ্র বিরাটতার পিছনে এইসব সুকুমার শিল্প কোথায় লুকানো থাকে? কি হাসি দেখলুম ওর মুখে! কি তুলতুলে গাল!...

একটা উপমা মনে আসচে। আমাদের দেশের বারোয়ারীর আসরে কে যেন রবিবাবুর মুক্তধারা থেকে 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র' নমো যন্ত্র' ওই গানটি আবৃত্তি করচেন। ওর ধ্বনির সঙ্গে ভাবের অপূর্ব্ব যোগ, ওর মধ্যে যে অদ্ভুত ক্ষমতা ও চাতুর্য্য প্রকাশ পেয়েচে, তা কে বুঝচে? কি হয়তো এক কোণে এক নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসে আছেন—আসর-ভরা দোকানদার দলের মধ্যে তিনিই একমাত্র নীরব রসগ্রাহী, কবির ক্ষমতা বুঝচেন তিনি। চোখ তাঁর জলে ভাসচে, বুক দুলে উঠেচে।'

বিশ্ব-সৃষ্টির এই অসীম চাতুর্য্য, এই বিরাট শিল্প কৌশল এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য্য—ক'জন বুঝবে? দোকানদার দলের মত হাততালি দিচ্চে হয়তো সবাই। কিন্তু কে মন দিয়েচে ওদিকে—কে ভাবচে এই অপূর্ব্ব, অবাচ্য, অভাবনীয়, অদ্ভুত সৃষ্টির কথা!... মানুষের অভিধানে যাকে বর্ণনা করবার শব্দ নেই।

এক-আধজন এখানে ওখানে। **Sir Oliver Lodge, Flammarion, Jeans, Swinburne,** রবীন্দ্রনাথ, এঁদের নাম করা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "এদের কাৎনাতে ঠোক্‌রাচ্চে।"

আনন্দ! আনন্দ!

"আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে"

কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হোল। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগ করলেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল করেন, দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে।

আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশী।

এবার বাড়ি গিয়ে গত শনিবারে অনেকদিন পরে কি আনন্দই পেলুম। মটর লতা, কাঠবেড়ালী, নাটাফুল—বর্ষাসরস লতাপাতায় ভরা সুগন্ধ। কাল প্রবাসী থেকে গিরীনবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে বিন্ সাহেবের কাছে অনেকদিন পরে। বেশ দিনটি কাটলো। বিভূতির সঙ্গেও দেখা।

আজ সকালে উঠে অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই কীর্ত্তনের গানটা মনে পড়ল "···যাত রহি" শেষ ছুটো কথা ছাড়া আর আমার কিছু মনে নেই, অথচ গানের ভাবটা আমি জানি। ভারী আনন্দ হোল আজ মনে। শুধুই মনে হচ্ছিল জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখতে শিখিনে বলেই যত গোল বাধে। জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্র হবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।

সেইদিক থেকে দেখলে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ; দৈন্য বড় সম্পদ; শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবন শুধু ধনে মানে সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখে-সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্য্যের, বিলাসের মেলা—যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে

জানে না, যে জীবনে শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্নার বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র দুধ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ-ধনসম্পদ-ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।

এক-এক সময় মনটা এমন একটা স্তরে নেমে আসে, যখন জীবনের আসল দিকটা বড় চোখে পড়ে যায়। আজ অনেকদিন পরে একটা সেই ধরনের শুভদিন। কলকাতার শহরে এ দিন আসে না।

আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপা হোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি—কত ভাবনা কত রাত জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্ত্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী অফিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক দুমাস লাগলো ছাপতে।

ঘনবর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সেসব কথা এখানে আর তুলবো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে বসে বনাতমোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা—সেই কার্ত্তিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা-জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়িটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তা-শ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে-সব ছবি—সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ'মাস কি খাটুনিটাই গিয়েছে! জীবনে কখনও বোধ হয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত কাটিয়েচি। মাথা ঘুরে উঠেচে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে লালফুল-ফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকাল

ছ'টা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বই-এর শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকাটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক করে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি. গা-হাত-পা যেন কামড়াচ্চে।

যাক্। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি ; তা যে দিইনি, তিনি অন্ততঃ সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কিনা জানি না, আমার কাজ আমি করেচি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরনো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষদিকটাতে পার্কার ফাউন্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া. পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান্ নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পুর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জ্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্ত্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো. ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্ব্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূরজীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে এই কথাটি শুধু জানাতে চাই—

ভুলিনি। ভুলিনি। যেখানেই থাকি ভুলিনি···তোমারই কথা

লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুর-সংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙীন হয়েচে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়। কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সকলের ব্যর্থতা, বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েচে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে রাত্রে,—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানিনে। কোথায় পাবো ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাবো আজ হিরু-কাকাকে, কোথায় পাবো কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্চি।

যারা হয়তো আমার ছাপা-বই দেখলে খুশী হোত, তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হোক্, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায়নি আজ রাত্রে।

আজই সকালে দেশ থেকে এলুম। কাল বৈকালে গিয়েছিলুম বারাকপুরে। সইমার বড় অসুখ। ষষ্ঠীর হাট বাজার, জেলি গোপাল-নগর থেকে নিয়ে এল ঘি, ময়দা। নগেন খুড়ো সপরিবারে ওখানেই।

কি সুন্দর বৈকাল দেখলুম! সে আনন্দের কথা আর জানাতে পারি নে—ঝোপে ঝোপে নীল অপরাজিতা, সুগন্ধ নাটাকাঁটার ফুল, লেজ-ঝোলা হলুদডানা পাখীটা—অস্তসূর্য্যের রাঙা আভা, নীল আকাশ, মুক্তির আনন্দ, কল্পনা, খুশি।

আজ এখন সুটকেশ গোছাচ্চি। এই মাত্র আমি ও উপেনবাবু টিকিট করে এলুম, আজ রাত্রের ট্রেনে যাবো দেওঘর। কাল আবার সপ্তমী। ওখান থেকে হাজারিবাগ যাবার ইচ্ছে আছে, দেখি কি হয়।

বাবুর বোর্ডিং-এ, ১৯১৮ সালে। আজ শ্যামাচরণদাদাদের "মাধবা কঙ্কণ" বইখানা এনেচি। সেই কতকাল আগেকার সৌন্দর্য্য, সেই পূজোর পর বাবার সঙ্গে ম্যালেরিয়া নিয়ে প্রথম বাড়ি যাওয়া,—সেই দিদিমা।

সে সব অপূর্ব্ব স্বপ্ন-ভরা দিনগুলি! জীবনটা যে কী অদ্ভুত, অপূর্ব্ব—তা যারা না ভেবে দেখে তারা কি করে বুঝবে?···কি করে তারা বুঝবে কি মহৎ দান এটা ভগবানের!

সকালে আমরা মোটরে করে বা'র হলুম—আমি, উপেনবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু,। ঝরনার কি সুমিষ্ট জল।··একটু একটু বৃষ্টি হোল। কিন্তু পথের দুধারে কি অপূর্ব্ব গাছপালা, লতাপাতা, শালচারা, ঝরনা, বাঁশবন—দুধারের ঘন জঙ্গলে জংলা মেয়েরা কাঠ কাটচে—কি সুন্দর মেঘের ছায়া—ত্রিকূটের দু-এক স্থান থেকে নীচের দৃশ্য বড় মনোরম। একস্থানে বাঁশের ছায়ায় বসে ডায়েরী রাখলুম। বড় সুন্দর দৃশ্য!

অর্দ্ধেকটা উঠে বড় পরিশ্রম হোল বলে—সকলে উপরে উঠতে চাইলেন না। "অয়ি কুহকিনী লীলে—কে তোমারে আবরিল।" দিব্য শালবনের ছায়ায় বসে—ডায়েরী রাখলুম। আবার মনে পড়ে—বাড়ির কথা।

আজ বিজয়া দশমী। আকাশও বেশ পরিষ্কার। সকালের দিকে আমরা সকলে মোটরে বা'র হয়ে প্রথমে গেলুম পূর্ণবাবুর বাড়ি। সেখানে আজ ওবেলা কীর্ত্তন হবে, পূর্ণবাবু আসবার নিমন্ত্রণ করলেন। সেখান থেকে বিমানবাবুর বাড়ি। আমি ও করুণাবাবু মোটরে বসে রইলুম—অমরবাবু ও উপেনবাবু নেমে গেলেন। সেখান থেকে কর্ণীবাগে ফকিরবাবুর ওখানে যাওয়া গেল। একটু দূরে মাটির মধ্যে তপোবনের পাহাড়টা চোখে পড়ল। কালকার বালানন্দ স্বামীর আশ্রমটাও পাশেই পড়লো দেখলুম। আজ কিন্তু সেখানে লোকের ভিড় ছিল না—কতকগুলি এদেশী স্ত্রীলোক রঙীন কাপড় পরে

দাঁড়িয়েছিল দেখলুম। সেখান থেকে করুণাবাবুর বাড়ি হয়ে এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে অমরবাবুর কি কাজ ছিল তা সেরে যাওয়া গেল দুর্গামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে। দুর্গাপ্রতিমা ভারী সুন্দর করেচে—অমন সুন্দর প্রতিমার মুখ অনেকদিন দেখি নি। তারপরে বাঙ্গালীদের পূজামণ্ডপে এসে খানিকক্ষণ থাকতেই তারা খেতে বললে। কিন্তু আমি তখন স্নান করি নি। কাজেই আমার হোল না।

বৈকালে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। এত সুন্দর স্থান আমি খুব বেশী দেখি নি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। পাহাড়ের উপর গাছপালা বেশী নেই, বন্য আতাগাছই বেশী। কিন্তু পিছনে ধূসর ত্রিকূট পাহাড়ের দৃশ্য ও সম্মুখে অস্তরাগ-রক্ত আকাশের তলে ডিগ্‌-রিয়া পাহাড়ের শান্ত মূর্ত্তি বাস্তবিকই মনে এক অদ্ভুত ভাব আনে। দূরে দূরে শাল মহুয়া বন, শুধু উঁচু-নীচু ভূমি ও বড় বড় পাথর এখানে ওখানে পড়ে আছে। অনেকে পাহাড়ের ওপর বেড়াতে এসেচেন। এত সুন্দর হাওয়া!—এককথায় মনে হোল বাল্যকালে মডেল ভগিনী বইয়ে এই নন্দন পাহাড়ের হাওয়ার কথা পড়েছিলুম—চারিধারে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে বসে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের আড়ালে অস্তমান সূর্য্যের দিকে চোখ রেখে কত কথাই মনে আসছিল। উপেনবাবুর ও দ্বিজেনবাবুর অবিশ্রান্ত বকুনির দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ মনে হোল আজ আমাদের গ্রামেও বিজয়া দশমী। সারা বাংলাতে আজ এসময়টিতে কত নদীতে কত বাচ্‌ খেলার উৎসব, কত হাসিমুখ। আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারেও এতক্ষণ বিজয়ার আড়ং চল্‌চে—এতক্ষণ বাদা ময়রা তেলেভাজা জিলিপি বিক্রী করচে —সবাই নতুন কাপড় পড়ে সেজে এসে বাঁওড়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর দেখবার জন্যে। ছেলেবেলার মত বাঁওড়ে বাচ্‌ হচ্চে। মনে পড়ে অত্যন্ত শৈশবের সেই শালুক-ফুল তোলা, তারপরে বড় হয়ে একদিনের সেই বন্ধুর কাছে চার পয়সা ও মুড়কির কাহিনীটা।

ফিরে আসতে আসতে মনে হোল এতক্ষণ আমাদের দেশে পথে পথে নদীর ধারে প্রিয় পাড়াগাঁয়ের সুপরিচিত ভাঁট্‌-শেওড়ার বনে

অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, সেই কটুতিক্ত অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ উঠচে—সেই পাখীর ডাক—এখানকার মত দূরপ্রসারী উচ্চাবচ পাথুরে জমি ও শাল মহুয়া পলাশের বন সেখানে নেই, এরকম পাহাড় নেই স্বীকার করি, কিন্তু সে-সব অপূর্ব্ব মধুর আরামই বা এখানে কোথায়? মনে পড়ে বহুকাল পূর্ব্বে এই সময়েই শৈশবের সেই "মাধবী কঙ্কণ" ও "জীবন প্রভাত"—সেই পাকাটির আঁটি ও ছিরে-পুকুর। বইখানা সেদিন শ্যামাচরণদাদার কাছে চেয়ে নিয়ে এলুম। সে-সব দিনের অপূর্ব্ব মধুর স্মৃতি-সারাজীবন অদৃশ্য ধূপবাসের মত ঘিরেই রইল। এই নিয়েই তো জীবন—এই চিন্তাতে, এই স্মৃতিতে, এই যোগে। এই মনন ও ধ্যান ভিন্ন উচ্চ জীবনানন্দ লাভ করবার কোনো উপায় নেই। এ আমার জীবনের পরীক্ষিত সত্য।

নন্দন পাহাড় থেকে ফিরে এসে দেখলুম অমরবাবুর বাংলোতে ৺বিজয়া-সম্মিলনী বসেচে। গোল চাতালটাতে জ্যোৎস্নার আলোতে চেয়ার পেতে বিমানবাবু, রবিবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু সবাই বসে আছেন। ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ও কুশলাদির আদান-প্রদানের পরে চা ও খাবার খাওয়া হোল। একটু পরে ফকিরবাবু এলেন। অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্যিক আলোচনা চলল। আমি ও বিমানবাবুর জামাতা রবিবাবু অনেকক্ষণ ধরে টলষ্টয় ও রুশীয় সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। রবিবাবু আমার 'পথের পাঁচালী'র প্রশংসা করছিলেন। বললেন, অনেকে বলচেন, 'পথের পাঁচালী' শেষ হোলে বিচিত্রা ছেড়ে দেবো। আমি ও করুণাবাবু ঘরের মধ্যে এসে বসে সিগারেট খেলুম ও ফকিরবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের ঝাল ঝাড়তে শুরু করলুম। তারপরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে সেটা একটু কমে গেল—বিমানবাবু ও রবিবাবু চলে গেলেন—আমরাও পূর্ণবাবুর বাড়িতে কীর্ত্তন শুনতে গেলুম। দক্ষিণা ঘোষ বলে একজন ভদ্রলোক সেখানে বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলছিলেন—আমার বেশ লাগলো। খুব জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে জোরে মোটর হাঁকিয়ে অনেক রাত্রে বাংলোতে ফেরা গেল। বেশ লাগছিল।

কাল সকালে সম্ভবতঃ গিরিডি হয়ে এ পথে মোটর-বাসে হাজারিবাগ ও সেখান থেকে রাঁচী হয়ে কলকাতায় ফিরবো। দেখি কি হয়। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও যাবো না।

অমরবাবুর দৌহিত্র অমিতের কথাগুলি ভারী মিষ্টি। তিন বৎসরের শিশু। বেশ লাগে ওকে।

এইমাত্র সন্ধ্যা ছ'টার দিল্লী এক্সপ্রেসে দেওঘর থেকে ফিরে এলুম। সারা দিনটা কাটল বেশ। বড় রোদ ছিল। করুণাবাবু সারা পথ কেবল গানের বই বা'র করেন আর আমাকে এটা ওটা গাইতে বলেন—করুণাবাবু সম্পূর্ণ বেসুরে গাইতে থাকেন। মধুপুরে আমার নেমে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু উপেনবাবু নামলেন না বলে আমিও আর নামলুম না। তাতে আমার মন খারাপ ছিল, সেটা দূর করে দেওয়ার জন্যে আমার মুখের সামনে একটা সিগারেট ধরলেন।

তারপর আবার চললো তাঁর সেই বেসুরে গজল গাওয়া। শিশির-কুমার ঘোষের বড় ছেলেও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন—বেশ লোক। হুগলী ব্রীজ থেকে সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো—আমার মনে হোল সেই এক ফাল্গুন দিনে চুঁচুড়ায় শখের থিয়েটার ও গোলাপ ফুলের কথা। সেই দুপুরের ঝম্-ঝম্ রোদে ফাল্গুনের অলস অবশ হাওয়ায় এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পায়চারির কথা কি কখনো ভুলবো।

মধ্যে আবার খুব বৃষ্টি এল। কলকাতায় কিন্তু বৃষ্টি একটু একটু মাত্র। উপেনবাবু বললেন, আমার অনুচরগণ হেরে গিয়েচে।

এইমাত্র মেসের বারান্দাতে নির্জ্জনে জ্যোৎস্নার আলোতে বসে আছি। বেশ লাগচে। মন মুক্ত, কারণ সম্মুখে প্রচুর অবসর।

এরই মধ্যে দেওঘর যেন দূরে হয়ে পড়েচে। আজই সকালে উঠে যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি দেওঘরের পথে পথে বেড়িয়ে বেড়িয়েচি, তা কি স্বপ্ন? আজই তো ভোরে পশ্চিম আকাশে ধূসর ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের রহস্য-ভরা মূর্ত্তি ও ত্রিকূটের পিছনের আকাশের

অরুণচ্ছটারক্ত সৌন্দর্য দেখেচি, তা যেন মনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।

করুণাবাবুকে বড় ভাল লাগলো। কি শান্ত, সরল হাস্যপ্রিয়, সরল স্বভাবের যুবক!...গান গলায় নেই, তবু অনবরত গান গাইতে গাইতে জোরে চেঁচাতে চেঁচাতে এলেন—সকলে মুচকি হাসচে—গোপনে চোখ ইশারা করচে পরস্পরে, তাঁর দৃকপাতও নেই। তিনি তা বুঝতেও পারচেন না। আপন মনে গান গেয়েও চলেচেন আর আমাকে ডেকে ডেকে বলচেন—আসুন বিভূতিবাবু, এইটে ধরা যাক্ আসুন—আমার সুরও তাঁর গলার বেসুরাতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দৃকপাতও নেই, সুর-বেসুর সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই। শিশুর মত সরল ভদ্রলোক।

'Men such as these are the salt of the Earth.'

পরশু থেকে কি বিশ্রী বাদলা যে চলচে! কাল গেল কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজার দিনটা—কিন্তু সারাদিন কি ভয়ানক বর্ষা আর নিরানন্দের মধ্যে দিয়েই কাটলো! আজও সকাল থেকে শুরু হয়েচে—কাল সারারাতের মধ্যে তো একদণ্ড বিরাম ছিল না বৃষ্টির। কার্ত্তিক মাসে এরকম বাদলা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। এসব সময়ের সঙ্গে তো বাদলার association মনে হচ্চে আলো জ্বালতে হবে। কাল যখন গিরিজাবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছিলুম তখন কেবল ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটু ধরেছিল। রেঙ্গুন যাওয়ার কথা উমেশবাবু যা লিখে রেখে গিয়েচেন, তা এ বৃষ্টিতে কি করে হয়? আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও গিয়ে সুখ নেই।

কাল রাত্রে গিয়েছিলুম শিমূলতলা। সেখানে থেকে আজ সকালের ট্রেনে বা'র হয়ে এখানে এসে সন্ধ্যায় পৌছান গেল। ঠিক সন্ধ্যায় গঙ্গার পুলটি পার হবার সময় এই শান্ত হেমন্ত-সন্ধ্যার সঙ্গে কত কথা জড়ানো আছে, যেন মনে পড়ে। সেই হুগলী ঘোলঘাট স্টেশন, সেই কেওটা সেই হালিসহর, সেই হুগলী—বহুদূরের বাড়ির সে শান্ত অপরাহ্ণ।

যেখানে পথের ধারে শ্যামাচরণদাদারা কাঠ কাটিয়েচে, শৈশবের মত সেই কাঠের গুঁড়িগুলো এখনও পথের ধারে যেন রয়েচে—এসব ভাবলে এক অপূর্ব, বিচিত্র আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়। জীবনের সেই মধুর-প্রভাত-দিনগুলোর কথা মনে হয়। কাল দিদিমা গল্প করছিল, কবে নাকি সেই জাহ্নবী স্নানে কেওটা গিয়েছিলেন; বাবা সকালে মুখ ধুচ্ছিলেন আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বুড়ি ঠিক মনে করে রেখেচে সেই দিনটি থেকে জীবন আরম্ভ হয় না?…

এসেই ওদের বাড়ি গেলুম জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে। বিভূতি, ঘণ্টু খুব খেলা করলে। সেখান থেকে এই ফিরচি।

ভারী ঘটনাবহুল দিনটি। ভোরে উঠে প্রথমে গেলুম হেঁটে ইডেন্ গার্ডেনে। শিশিরসিক্ত ঘাসের ধারে ধারে জলের রক্ত-মৃনালগুলি দেখছিলুম। দুটি রাঙা ফ্রকপরা ফিরিঙ্গি বালিকা ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল। কেয়াঝোপে খানিকটা বসে বসে "আলোক সারথির"* ছক্ কাটলুম। পরে দু'খানা বায়োস্কোপের টিকিট কিনে বাড়ি ফিরবার পথে রমাপ্রসন্নের ওখান হয়ে এলুম।

বৈকালে প্রথম গেলুম প্রবাসী অফিসে। কেদারবাবু মোটরে ঢুকচেন, গেটের কাছে নমস্কার বিনিময় হোল। সজনীর ঘরে গিয়ে দেখি ডাঃ সুশীল দে বসে আছেন। একটু পরে নীহারবাবুও এলেন, খুব খানিক গল্প-গুজবের পর তিনজনে গেলুম সজনীর বাড়ি। উষাদেবী চলে গিয়েচেন। আমার বইখানি গিয়েচেন নিয়ে।

সেখানে "বাঁশি বাজে ফুল বনে" গানটা শুনলাম না বটে, একটা জৌনপুরী টোড়ী রেকর্ড শুনলাম। চা পানের পরে ডাঃ দে বাড়ি চলে গেলেন; আমরা তিনজনে গেলুম বায়োস্কোপে। পথে বার বার চেয়ে দেখছিপুম—আজ পূর্ণিমা, মানিকতলা স্পারের পিছন থেকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে। বহুদূরের আমাদের বাড়িটাতে নারিকেল গাছটার পিছন থেকে চাঁদটা ওই রকম উঠচে হয়ত। সেই সময়টা—সেই "আমার

অপূর্ব্ব ভ্রমণ"; "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"—সে কি অপূর্ব্ব শৈশবের আনন্দ উৎসাহ,—কি অপূর্ব্ব বিচিত্র জীবনটা তাই শুধু ভাবি।

Sunrise filmটা মন্দ নয়। হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে গিরিজাবাবুর সঙ্গে দেখা, নমস্কার বিনিময় ও আলাপ হোল।—বাবু **B. P. C. C.** থেকে **returned** হয়েচেন শুনলুম, মনটা একটু দমে গেল। বায়োস্কোপ দেখে ফেরবার পথে দীনেশ দাশের সঙ্গে দেখা। প্রবাসী অফিসে মানিকবাবু জানালে, কেদারবাবু মঙ্গলবারে লেখা চান। আবার প্রবাসীতে যাবার আগে বিচিত্রা অফিসে উপেনবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও খুব শীঘ্র লেখা চান। **Sub Editor**-এর **declaration**টা শীঘ্র দিতে হবে তিনি জানালেন।

তারপর বায়োস্কোপ থেকে গেলুম বিভূতিদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে দেখি বৈঠকখানাতে বায়োস্কোপ হচ্চে। বিভূতি বসতে বললে। তারপর দেবেন ও হীরুদের সঙ্গে খেতে বসা গেল। অনেকদিন পরে আজ আবার সেই রাস-পূর্ণিমা।

বেরিয়ে অনেকদিন আগের মত একখানা রিক্‌শা করে জ্যোৎস্নায় ছাতিম ফুলের গন্ধের মধ্যে দিয়ে বাসায় ফিরলুম। সেই ১৯২৩ সাল ও এই। এই ছয় বৎসরে কত পরিবর্ত্তন।

কে জানত উপরের ডায়েরীটা লিখবার সময় যে এই দিনটাতেই রাসপূর্ণিমার বায়োস্কোপের আসরেই ওদের বাড়ির সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা!

বাসায় এসে বারান্দায় রেলিং ধরে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—যেন এক গ্রহদেব এই অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে হু-হু করে উড়ে চলেচেন ওপরে—ওপরে--সজোরে—সবেগে—পায়ের নীচে পুরাতন পরিচিত পৃথিবীটি রইল পড়ে—।

বহুদূর আকাশে যেখানে পরমাণু তৈরী হচ্চে, উল্কারা ছুটচে, ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে, নক্ষত্র ছুটচে—সেখানে।

বঙ্কুর জ্বর হয়েচে—আজ দাদাকে পত্র দিয়েচি। দাদা যেতে বলেচেন, তা কি করে হয়। সেদিন বঙ্কুর অত্যাচারের কথা কত

শুনলুম। তার স্ত্রী, বোন ও শাশুড়ীঠাকরুন বললেন। শুনে দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় কি!

জ্যোৎস্নারাত্রে আমাদের বাড়িটা বহুদূরে কেমন দাঁড়িয়ে আছে, কাঠ কাটা হয়েচে, আমাদের বাড়ির সামনে ছেলেবেলাকার মত পথের ওপর তার দাগ রয়েছে। শ্যামাচরণ-দাদাদের কাঠ।

সে এক জীবন!

কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব্ব এই জীবন-ধারা! একে ভোগ করতে হবে।

এই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় ইসমাইলপুরের জন্যে মন উদাস হয়ে যায়: যেন তার বিশাল চরভূমি, কালো জঙ্গল, নির্জ্জন বালিয়াড়ি—আমায় ডাক দিচ্চে।

কাল স্কুলে ছ'টায় ম্যানেজিং কমিটির মিটিং, এদিকে আবার তিনটার সময় ডাঃ দের ওখানে চা-পানের নিমন্ত্রণ।

আজ দুপুরে মনে পড়ছিল বোর্ডিং-এ থাকতে **Traveller's return** গল্পটা কি অপূর্ব্ব **emotion** নিয়েই পড়তুম। বাল্যের সে সব অপূর্ব্ব **emotion** মনে পড়লেই মনে হয় কি অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র এ জীবনধারা! সেদিনের সন্ধ্যায় নন্দরাম সেনের গলিতে যাওয়া, সেই চাউলের গুদাম—সেই শুভঙ্করী পাঠশালার সামনে আমার সহপাঠীর বাড়ি মনে পড়ে।

কি সুন্দর!

এসবের জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেবো?—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

আজ মনের মধ্যে যে তীব্র **creative** আনন্দ অনুভব করলুম, কলকাতায় এসে পর্য্যন্ত এক বছরের মধ্যে তা হয়নি কোন দিন।

আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কি হলো আমার, অকারণ আনন্দে মনের পাত্র উপচে পড়চে, একে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না।

মন যেন কি বলে বুঝতে পারি নে। কত কথা মনে হোল ····
সারা জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য্য আজ আমার মনে ভিড় করেছে····

স্মরণীয় দিন, অতি স্মরণীয় দিন, এরকম কিন্তু খুব বেশী দিন আসে না।···

ইন্‌স্টিট্যুটে সেই মহিলা পর্য্যটকের কথা পড়ছিলুম—তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে উত্তরমেরু প্রদেশের বরফ জমা নদী ও অন্ধকার অরণ্য-ভূমির মধ্যে তিনি তাঁবু ফেলে রাত্রে বিশ্রাম করতেন, দূর মেরু-প্রদেশীয় **Northern Light** জ্বলে, একা তিনি তাঁবুতে—"**amidst a waste af frozen river, and dark forests**"—সেখানকার নৈশ নীরবতা···নির্জ্জনতা···গভীর শান্তি, মাথার উপর হলুদ রং-এর চাঁদ, অবাস্তব, অন্য গ্রহের জ্যোতিষ্কের মত দেখায় নৈশ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র···আশেপাশে শুভ্রতুষারাবৃত পাইন অরণ্যের আড়ালে লোলুপ নেকড়ের দল—আর ভাবতে পারা যায় না, মনকে বড় মুগ্ধ, অভিভূত করে।

সন্ধ্যাবেলা এসে চেয়ারটাতে বসে চুপ করে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল এই সব শীতের রাত্রের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির পেছনের ঘন বনে শিয়াল ডাকতো গভীর রাত্রে···সেই বিপদের ভয়, অজানার মোহ, গ্রাম্য জীবনের সৌন্দর্য্য···অদ্ভুত অপূর্ব্ব···

আরও মনে পড়লো ইসমাইলপুরের জ্যোৎস্না রাত্রির সে অপার্থিব, **weird beauty**···সেই এক পূর্ণিমা-রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নার ঢেউয়ের নীচে আকন্দ-গাছ···স্বপ্নে যেন দেখি··

সেই কুমোরদের বাড়ি চাক ঘোরাচ্ছে দাসু···পঞ্চাননতলায় কালীপূজো···

ভগবান, কি অসীম বিচিত্রতা দিয়ে এই জীবন, আমার শুধু নয়, সকলের জীবন গড়ে তুলচো—তা কে দেখে? কে বোঝে?

ধন্যবাদ, অগণিত ধন্যবাদ··হে সৌন্দর্য্যস্রষ্টা মহাশিল্পী, তোমাকে অন্তরের প্রেম কি বলে জানাবো, ভাষা খুঁজে পাই না···

এ তো শুধু পৃথিবীর সুখদুঃখের কথা লিখচি—তবুও তো আজ নাক্ষত্রিক শূন্যের কথা ভাবি নি, অন্য অন্য জগতের কথা তুলি নি। অন্য গ্রহ-উপগ্রহের কথা ওঠাই নি···

দূর-দূরান্তের কথা তুলি নি···

নতুন বৎসরের প্রথম দিনটাতে এবার মোটরে করে শ্রীনগর গেলুম। চালকী থেকে খুকীকে তুলে নিলুম, পরে গোপালনগরের বাজারে বন্ধুর ড্রাইভার গৌরকে হরিবোলা ঠিক করে দিলে। ড্রাইভারটা প্রথমটাতে মেঠো পথে যেতে চায় না। অবশেষে অনেক করে রাজী করানো গেল। সিমলাতে গিয়ে কালাকে ডাকতে পাঠানো গেল, সে নাকি ভাত রাঁধচে। একটি ছোট মেয়ে জল নিয়ে এল বালতিতে করে। খাবার খেয়ে নিয়ে আমরা আবার হলুম রওনা। শ্রীনগরের বনের মাথায় মটর ফুলের মত একরকম ফুল অজস্র ফুটে আছে, এত চমৎকার লাগছিল। আসবার সময় ডাইনে পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল—আকাশের কি চমৎকার রঙটা যে!

রাত আটটার সময় পৌঁছে গেলুম কলকাতা, ঠিক চারটার সময় সিমলা থেকে ছেড়ে। এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। **Sense of space** মানুষের ক্রমেই কেমন পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে। এক শত বৎসরের পূর্ব্বে যা কিনা পাকা তিন দিনের পথ, গরুর গাড়িতে চার দিনের পথ ছিল।···কে জানে আমাদের পৌত্র বা প্রপৌত্রদের **Sense of space** আরও কত পরবর্ত্তিত হবে!—

আজ অনেকক্ষণ কার্জ্জন পার্কে একা একা বেড়ালুম। পশ্চিম আকাশে সূর্য্যটা অস্ত যাচ্ছিল,—আমার শুধু মনে যুগ যুগের কল্পনা জাগে। ঐ নক্ষত্রটা যে ওইখানে উঠেছে, ওতেও কত অপূর্ব্ব জীবনলীলা···। মৃত্যু, বিরহ এসব যদি জীবনে না থাকতো তবে জীবনটা একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়তো—হারাবার শঙ্কা না থাকলে প্রেম, স্নেহও হয়তো গভীর ও মধুর হতে পেত না। তাই যেন মনে হয় কোন সুনিপুণ শিল্প-স্রষ্টা এর এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেচেন যেন অতি তুচ্ছ, দরিদ্র লোকেরও জীবনের এ গভীর অনুভূতির দিকটা বাদ না যায়। এ জীবনের অবদানকে খুব কম লোকই বুঝলে—কেউ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না—সকলেই দৈনন্দিন আহার-চিন্তায় ব্যস্ত। কে

ভাবে জন্ম নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে? অবকাশ, ঈশ্বর, প্রেম, অনুভূতি—এসব নিয়ে কার মাথাব্যথা পড়েচে?

মুটু ও নায়েব ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম।—**Lief Ericsson was space hungry: So am I.**

জানি না কেন আজ ক'দিন থেকে মনটা কেবলই মুক্তির জন্য ছটফট করচে। কি ভাবের মুক্তি! আমাকে কি কেউ শিকলে বেঁধে রেখেচে?···তা নয়। কিন্তু কলকাতার এই নিতান্ত মিনমিনে, এক-ঘেয়ে, ঘরোয়া জীবনযাত্রা, আজ পনেরো বৎসর ধরে যে জীবনের সঙ্গে আমি সুপরিচিত,—সেই বহুবার দৃষ্ট গতানুগতিক, একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা আর আমার ভাল লাগে না।

আজ দুপুরবেলা স্কুলের অবসর ঘণ্টায় চুপি-চুপি এসে বাইরের ছাদটাতে বসেছিলুম। আকাশ ঘন নীল, কোথাও এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে—কেবল একটা চিল বহুদূরে একটা কৃষ্ণ-বিন্দুর মত আকাশের গা বেয়ে উড়ে যাচ্ছে—সেদিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে আমার মন কোথায় যে উড়ে গেল, কি অপূর্ব্ব প্রসারিত করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে মনে জাগল—সে-সব কথা কি লিখে বলা যায়? মনের সে উচ্চ আনন্দের বর্ণনা দেওয়ার উপযুক্ত ভাষা এখনও তৈরি হয় নি। কিন্তু কেন সে আনন্দটা এল, তাও বুঝতে পারি—সেটা এল শুধু জগতের বড় বড় মরু, বিশাল অরণ্যভূমি, দিক্‌দিশাহীন সমুদ্র, মাঠ ও বনঝোপ, মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব্ব মুক্ত রূপের কল্পনায়।

বুঝতে পারি এরই জন্যে মনটা হাঁপাচ্চে। প্রকাণ্ড কোনো মাঠের ধারে বন, বনের প্রান্তে একটি বাংলো—কিংবা জঙ্গলে ঘেরা অভ্রের খনি, বালু-মিশ্রিত পাথুরে মাটির গায়ে অভ্রকণা চিক-চিক করচে, নয়তো উচ্চাবচ পাহাড়ে জমি, যেদিকে চোখ যায় শুধুই বন—এই রকম স্থানেই যেতে চাই—থাকতে চাই। এতটুকু স্থান চায় না মন। চায় আরও অনেক বড় জায়গা—অনেকখানি বড়—অচেনা, অজানা, রুক্ষ, কর্কশ ভূমিশ্রী হলেও তা-ই চাইবো, এ একঘেয়ে

পোষমানা শৌখীনতার চেয়ে।

সন্ধ্যাবেলা যে ছবিটা দেখতে গেলুম গ্লোবে, সেটাও আমার আজকের মনের ভাবের সঙ্গে এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেল,—'Lief the viking' গ্রীনল্যাণ্ড ছেড়ে আরও দূরে, অচেনা দেশ খুঁজে বার করতে অজানা পশ্চিম মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়ে চলে গেল— নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না-ঝরা আকাশ-তলায় সদ্য ফোটা মরসুমী ফুলগুলোর দিকে চোখ রেখে এইমাত্র গোলদীঘির ধারে বসে সেই কথাই আমি ভাবছিলুম।

ভাবতে ভাবতে মনে হল আমি যেন এই জগতের কেউ নই— আমি যেন বহুদূর কোন নাক্ষত্রিক শূন্যপারের অজানা জগৎ থেকে কয়েক দণ্ডের কৌতূহলী অতিথির মত পৃথিবীর বুকে এসেচি—ও মরসুমী ফুল আমি চিনেও চিনি না, প্রতিবেশী মানুষদের দেখেও যেন দেখি নি, এ গ্রহের বৈচিত্র্যের সবটাই নিয়েচি কিন্তু এর একঘেয়েমিটা আমার মনে বসতে পারে নি এখনও। তার কারণ আমার গতি— স্বর্গীয় গতির পবিত্রতা।

মনে হল এইমাত্র যেন ইচ্ছামত পৃথিবীটা ছেড়ে উড়ে আলোকের পাখায় চলে যাবো ওই বহুদূরে ব্যোমের গভীর বুকে, যেখানে চির-রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা নির্জ্জন সাথীহীন নক্ষত্র মিট্-মিট্ করে জ্বলচে—ওর চারপাশে হয়তো আমাদের মত কোন এক জগতে অপর কোন রূপ বিবর্ত্তনের প্রাণী বাস করে—আমি সেখানে গিয়ে খানিকটা কাটিয়ে আবার হয়তো চলে যাবো কোন্ সুদূর নীহারিকা পার হয়ে আরও কোন্ দূরতর জগতের শ্যামকুঞ্জবীথিতে!

এই সময়ে মৃত্যুর অপূর্ব্ব রহস্য যা সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে থেকে গোপন আছে—তার কথা ভেবে মন আবার অবাক হয়ে গেল—সারা দেহ মন কেমন অবশ হয়ে গেল।···

কোন্ বিরাট শিল্প-স্রষ্টার পুণ্য অবদান এ জীবন?···কি অতল-স্পর্শ, মহিমাময় রহস্য!···রোমাঞ্চ হয়। মন উদাস হয়ে যায়—যখন বাসায় ফিরলুম, তখন যেন কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব।···

জীবনকে যে চিনতে পেরেছে—এ জগতে তার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নেই—যার কল্পনার পঙ্গুতা ও ভাব-দৈন্য দৈনন্দিন ভোগবিলাসের উর্দ্ধে তাকে উঠতে প্রাণপণে বাধাদান করেচে, সে শাশ্বত-ভিখারীর দৈন্য কে দূর করবে ?…

আজ অনেককাল পরে—প্রায় বারো বৎসর পরে—শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখে এইমাত্র ফিরচি। সেই ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেখবার পরে এই আজ দেখা। অভিনয় খুব ভালই হল, কিন্তু আমি, কি জানি কেন, মনের মধ্যে প্রথম যৌবনের সে অপূর্ব্ব উন্মাদনা, নবীন, টাটকা, তাজা মনের সে গাঢ় আনন্দানুভূতিটুকু পেলাম না। দেখে দেখে যেন মনের সে নবীনতাটুকু হারিয়ে ফেলিছি।

আজকাল অন্যদিক দিয়ে মনের মধ্যে সব সময়ই একটা অপূর্ব্ব উৎসাহ পাই—একটা অন্য ধরনের উদ্দীপনা। সেটা এত বেশী যে, তা নিয়ে ভাবতেও পারি না—ভাবলে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মনে হয় এই যে কলকাতার একঘেয়েমি যাকে বলচি—এ-ও চলে যাবে। সে যাত্রার বাঁশি যেন বেজেছে মনে হচ্চে। বহুদূরে যাত্রা। সমুদ্রের পারে—প্রশান্ত মহাসাগরের পারে।

নানা দার্শনিক চিন্তা মনে আসচে, কিন্তু রাত হয়েচে অনেক আর কিছু লিখবো না।

ক'দিন বেশ কাটচে। অনেক দিন পরে ক'দিনের মধ্যে ভোম্বল-বাবু, ননী, নানু, প্রসাদ—এরা সব এসেছিল। সেদিন অনেকদিন পরে রাজপুরে গেলুম। খুকীর সঙ্গে দেখা হল, ভারী যত্ন-আদর করলে। তারপর একদিন গড়িয়ায় জলের ধারের মাঠে, আমি ও ভোম্বল বেড়াতেও গেলুম। কত কি গল্প আবার পুরনো দিনের মতই হল। একদিন আমি অবশ্য একা গিয়েছিলুম,—পূর্ণিমার দিন।

আজ বসে বসে সেই দিনগুলোর কথা ভাবছিলুম। যাত্রাদলের ছেলে ফণি বাড়িতে খেতে এল—বাবা বর্দ্ধমান থেকে এলেন—তারও

অনেক আগে যখন বকুলতলায় প্রথম বারোয়ারীর বেহালা বাজানো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—সে-সব টাটকা—তাজা, আনকোরা আনন্দ এখনও কিন্তু যেন ভাবলে কিছু কিছু পাই। যেদিন সেই প্রথম বেহালা বেজেছিল, যেদিনটা বাবার সঙ্গে নৈহাটী হয়ে সিঙ্গাড়ার আলু খেয়ে কেওটা থেকে বাড়ি আসছিলুম—যেদিন চড়ক তৈরি করলুম—ঠাকুরমাদের বেলতলায় আমি নিজে; ঠাকুরমাদের পড়ো ঘরে পাঠশালা-করা, কড়ি খেলার আমোদ, পুবমুখো যাওয়া, মরাগাঙে মাছ ধরতে যাওয়া—শনিবারে ছুটিতে বাড়ি আসার আনন্দ—কত লিখবো। কে জীবনের এসব মহনীয় আনন্দ-পরম্পরার কথা লিখতে পারে? আর মনে হয় আমি ছাড়া এসবের আসল মানে আর কেই বা বুঝবে? তা তো সম্ভব নয়—অন্য সকলের কাছে এগুলো নিতান্ত মামুলী কথা মনে হবে। এদের পিছনে যে রসভাণ্ডার লুকানো আছে আমি ছাড়া আর কে তা জানবে?…

অনেকদিন পরে দেশে এসে বেশ আনন্দে দিন কাটচে। রোজ সকালে উঠে ইছামতীর ধারের মাঠটাতে বেড়াতে যাই, ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকে, এত পাখী ডাকে!…চোখ গেল, বৌ-কথা-ক', কোকিল—কত কি!…বেড়িয়ে এসে ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নামি। ওপারের চরের শিমুলগাছটার মাথায় তরুণ সূর্য্য ওঠে, দু'পারে কত শ্যামল গাছপালা। সোঁদালি ফুলের ঝাড় মাঝে মাঝে দুলতে দেখলেই আমার মনে কেমন অপূর্ব্ব আনন্দ ভরে ওঠে! প্রভাতে পাখীরা যে কত সুরে ডাকে, জলের মধ্যে মাছের ঝাঁক খেলা করে।—জীবনের প্রাচুর্য্যে, সরসতায়, সৃষ্টির মহিমায় অভিভূত হয়ে যাই। কতদূরের সব জীবনধারার কথা, জগতের কথা মনে হয়—আবার স্নান করতে করতে চেয়ে দেখি নদীর ধারে গোছা গোছা ঘাস হেলাগোছা ভাবে জলের মধ্যে মাথা দোলাচ্ছে, একটা হয়তো খেজুর গাছ গাজিতলার বাঁকে অন্য সব গাছ-পালার থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অপূর্ব্ব, সুন্দর, হে স্রষ্টা, হে মহিমময়, নমস্কার, নমস্কার। অন্য

সব জগৎও যে দেখতে ইচ্ছে যায়, দেখিও।

রোজ বৈকালে কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে ; মেঘ হয়, রোজ, রোজ। ঠিক তিনটা বেলা বাজতে না বাজতে মেঘ উঠবে, ঝড়ও উঠবে। আর সমস্ত আমবাগানের তলাগুলো ধাবমান, কৌতুকপর, চিৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরে যায়—সল্‌তে-খাগীতলা, তেঁতুলতলা, শ্যামাচরণদাদাদের বাগানটা, নেকো, পটুলে, বাঁশতলী—সমস্ত বাগানে যাতায়াতের ধুম পড়ে গিয়েচে—।

সেদিন ঘন মেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার সবাই—স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ বালকেরা ধামা হাতে আম কুড়ুচ্চে দেখে আমার চোখে জল এল। জীবনে ও-ই এদের কত আনন্দের, কত সার্থকতার জিনিস। একটা ছেলে বলচে—ভাই—ওই দোম্‌কাটায় মুই যদি না আসতাম, তবে এত আম পেতাম না!···

কাল সাতবেড়ে মেয়ে দেখতে যাবো।···

সারা গ্রামটাতে বিল্বগাছের ফুলের কি ঘন সুগন্ধ!···অশ্বত্থতলায়, যেখানে সেখানে এত বেলের গাছও আমাদের এখানে আছে!

কাল সাতবেড়ে গ্রামে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এলাম। শশী বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ি খুব আহার হল। গ্রামখানিতে সবই চাষা লোকের বাস, ভদ্রলো'কের বাস তত নেই, তবে সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। মাটির ঘরগুলো সেকেলে ধরনের কোনো নতুন আলো এখনও ঢোকে নি বলে সেখানের অকৃত্রিম আবহাওয়াটা এখনও আছে। ফণি কাকা ও আমি দুজনে দক্ষিণ মাঠের দায়েমের পুকুরের ধার দিয়ে বেশ ছায়ায় ছায়ায় বৈকালের দিকে চলে এলাম। নফর কামারের কলাবাগানে কামারবুড়ি কি ফলমূল ও কাঁকুড় নিয়ে আসচে দেখলাম। হরিপদ দাদার স্ত্রী বাগানে আম পাড়াচ্চেন।

আজকাল রোজ বৈকালে মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি হওয়ার দরুন কুঠির মাঠে একদিনও বেড়াতে যাওয়া হয় না। রোজই কালবৈশাখী লেগে আছে। সুন্দর বৈকাল একদিনও পেলাম না। তিনটা বাজতে না

বাজতেই রোজ জল আর ঝড়।

আজও সকালে নদীতে স্নান করে এলুম। কি সুন্দর যে মনে হয় সকালে স্নানটা করা, স্নিগ্ধ নদীজল, পাখীর কলকাকলী, মাছের খেলা, নতশীর্ষ গাছপালা, নবোদিত সূর্য্যদেব।

আজ বেড়াতে গেলুম বৈকালের দিকে কাঁচিকাটার পুলটাতে। সকালে অনেকক্ষণ চেয়ার পেতে ওদের বেলতলাটায়, বসেছিলুম, সেখানে কেবল আড্ডাই হল। বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে তখন গেলাম ঠাকুরমাদের বেলতলায়, ফিরচি, একজন লোক জটেমারীর কুঠি খুঁজচে, আমাদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে। তারপর নিজে গেলাম বেলেডাঙার পুলটায়। একখানা যেন ছবি, যখন প্রথম অশ্বত্থতলার পথটা থেকে ওপারের দৃশ্যটা দেখলাম—এ রকম অপূর্ব্ব গ্রামাদৃশ্য ক্বচিৎ চোখে পড়ে। বেলেডাঙা গ্রামের বাঁশবনের সারি নদীর হাওয়ায় মাথা দোলাচ্চে, কৃষক-বধূরা জল নিতে নামচে বাঁওড়ের ঘাটে। দুপারে সবুজ আউসের ক্ষেত, মজুরেরা টোকা মাথায় ক্ষেতে ক্ষেতে ছাঁটার কাজ করচে, ছোট ডোঙা চেপে কেউ বা মাছ ধরতে বেরিয়েচে—যেন ওস্তাদ শিল্পীর আঁকা এক অপূর্ব্ব ভূমিশ্রীর ছবি।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথায় মোট নিয়ে পাঁচপোতা থেকে ফিরচে—গোঁসাইবাড়ির কাছে বাস করেচে, বললে—নাম বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়। দেখে ভারী কষ্ট হল—একা ভাগ্যহীন, অসহায় মানুষ। বললে, শীতলা ঠাকুর নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়াই—যে যা দেয়, তাতেই চলে। বাড়িতে এক ছোট ছেলে আছে, ও দুটি মেয়ে।

বসে বসে অনেকক্ষণ হাওয়া খেলুম, সঙ্গে সঙ্গে কত দেশের জীবন-ধারার কথা, বিশেষ করে যারা দুঃখ পেয়েছে তাদের কথাগুলো বড় বেশী মনে হল। ভরতের মা দিন-রাত দুঃখ করচেন, তাঁর দুঃখ শুনে সত্যি মনে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে জগতের এত আনন্দ-ধারার এক কণাও এরা পাচ্চে না—হয়তো শুধু দেখবার চোখ নেই বলেই।

ফিরবার পথটি আজ এত ভাল লাগল, ওরকম কোন দিন লাগে

না—ডাঁশা খেজুর ও নোনা ডালে ডালে দুলচে—এত পাখীর গানও এদেশে আছে!···কুঠির মাঠটা যে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে—ইতস্ততঃ প্রবর্দ্ধমান গাছপালা বনঝোপের সৌন্দর্য্যে বিশেষ করে যেখানে সেখানে, যেদিকে চোখ যায়—ফুলে-ভরা সোঁদালি দোলায়িত; আকাশের রঙটা হয়েচে অদ্ভুত—অপূর্ব্ব নির্জ্জনতা শুধু পাখীদের কল-কাকলীতে ভগ্ন হচ্চে—কেউ কোনো দিকে নেই—ধূসর আকাশতলে গভীর শান্ত ও ছায়ার মধ্যে কেবল আমি ও মুক্ত উদার প্রকৃতি।

কি অপূর্ব্ব আনন্দেই মন ভরে যায়, কত কথাই মনে ওঠে, সাধ্য কি কলকাতায় থাকলে এ সব কথা মনে উঠতে পারে!···

তারপর ওপাড়ার ঘাটটিতে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে নেমে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্যামল, ধূসর বৃক্ষশ্রেণী, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, স্বচ্ছ নদীজল—মাথার ওপরে সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি উঠেচে, সেদিকে চেয়ে কত শত নক্ষত্র-মণ্ডলী, বিভিন্নমুখী নক্ষত্রস্রোত, অন্য অন্য নীহারিকাদের জগতের কথা মনে হল। বৃহৎ এণ্ড্রোমিডা নীহারিকাদের জগৎ। এই সামান্য, ক্ষুদ্র গ্রহটাতে যদি অস্তিত্বের এত বৈচিত্র্য, এত সরসতা, এত সৌন্দর্য্য তবে না জানি সে-সব বিশ্বে কি অপরূপ আনন্দস্রোত!··

সব দুঃখের একটা সুস্পষ্ট অর্থ হয়। জীবনের একটা মহান, বিরাট অর্থ, একটা সুস্পষ্ট রূপ মনের চোখে ফুটে ওঠে। নির্জ্জন স্থান ভিন্ন, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন ভিন্ন,—এ আনন্দ কি সম্ভব?··

···সন্ধ্যার পরে আমি, সইমা, ন'দি অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। আজকার রাতটা কালকার মত গরম নয়, শেষ রাত্রে মেঘ করার দরুন বেশ ঠাণ্ডা। সারারাত লণ্ঠন ধরে ধরে লোকেরা ও ছেলেদের দল আমাদের বাড়ির পিছনের ঘন জঙ্গলের ওপারের বাগানগুলিতে আম কুড়িয়েচে, সারা রাতটি।

কি সুন্দর বৈকালটি কাল কাটলো যে! কুঠির মাঠে অনেকক্ষণ বসে; পরে নদীজলে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্নান করতে নামা গেল। এত অপূর্ব্ব ভাব এল মনে, ঠাণ্ডা নদীজল, ছিপি-শেওলার পাতা

ধারে দাঁড়িয়ে, ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশ ও শ্যামল গাছগুলোর দিকে চোখ রেখে শুধু এদের পিছনে যে বিরাট অবর্ণনীয় শক্তি জাগ্রত আছে, তার কথাই বার বার মনে আসছিল। স্বচ্ছ জলের ভেতরে মাছের দল খেলা করচে—একটা ছোট মাছ তিড়িং করে লাফিয়ে শেওলার দামের গায়ে পড়ল। নদীজলের আর্দ্র সুগন্ধ উঠচে—ওপারে মাধবপুরের পটোলের ক্ষেতে তখনও চাষারা নিড়েন দিচ্চে—বাদাম গাছের মাথায় একটা নক্ষত্র উঠেচে। সারাদিনের গুমটের পর শরীর কি স্নিগ্ধই হল!…

শেষ রাত্রে বেজায় গুমট গরমে আইঢাই করচি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি এল। ন'দি, জেলি, বুড়ি-পিসিমা, জেলে পাড়ার ছেলেরা অমনি আম কুড়তে ছুটল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠন জ্বেলে সব ছুটল চাটুয্যে বাগানের দিকে। জেলির মা চেঁচিয়ে পিছু ডাকাতে জেলি আবার ফিরে এল।…

সকালটার সিঁদুরে মেঘে অপরূপ শোভা হয়েছিল। পরশু বৈকালটিতে এই রকমই সিঁদুরে মেঘ করেছিল—আমি সেটা উপভোগ করতে পারি নি, গোপালনগরের হাটে গিয়েছিলাম।

আজ প্রায় বাইশ বছর পরে ভাণ্ডারকোলায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বেলেডাঙার মাঠে যে অদ্ভুত মনের রূপ ও প্রকৃতির রূপ দেখেছিলাম, অমন কখনো দেখি নি। কাঁচিকাটার পুল থেকে ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুড়োর পত্রটা পকেট থেকে পড়চি—প্রমীলা মারা গিয়েচে লিখচে। সামনে অপূর্ব্ব রঙের আকাশটা ঘন হীরাকসের সমুদ্রের মত গাঢ় ময়ূরকণ্ঠী রঙের, পিছনে বর্ণ-সমুদ্র, কোথাও জনমানব নেই—গাছে গাছে পাখীর ডাক, দূরে গ্রামসীমায় পাপিয়া সুর উঠিয়েচে,—জীবনের অপূর্ব্বতা কি চমৎকার ভাবেই সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হল!…

কাল বৈকালের দিকে বেলেডাঙার বট-অশ্বত্থের পথটা বেয়ে

বেড়াবো বলে, কুঠির মাঠের পথটা দিয়ে চললুম সেদিকে—মাঠে পড়েই অবাক হয়ে পশ্চিম আকাশে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলুম। সারা বেলেডাঙার বনশ্রেণীর ওপর ঘন-কালো কাল-বৈশাখীর ঝোড়ো মেঘ জমেচে—অনেকটা আকাশ জুড়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মেঘচ্ছটা—আর তার ছায়ার চারিধারের বাঁশবন, ঘন সবুজ শিমুল ও বটগাছগুলো, নীচের আউশের ক্ষেত, বাঁওড়—সবটা জড়িয়ে সে এক অপরূপ মূর্ত্তি ধরেচে। বিশেষ করে ছবি দেখতে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েচে এক শিমূল ডালের—তার সোজা মগ-ডালটা মেঘের ছায়ায় ও উড়নশীল ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশের পটভূমিতে কোনো দেবশিল্পীর আঁকা মহনীয় ছবির মত অপূর্ব্ব। সেইটি দেখে চোখ আর আমার ফেরে না—কেমন যেন পা আটকে গেল মাটির সঙ্গে, অবশ হয়ে গেলুম, দিশাহারা হয়ে পড়লুম—ওঃ!—সে দৃশ্যটার অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের কথা মনে এলে এখনও সারা গা কেমন করে ওঠে।

তারপরই সাঁ-সাঁ রবে ওপরের দিক থেকে বিরাট ঝড় উঠলো—দৌড়, দৌড়, দৌড়,—হাঁপাতে হাঁপাতে যখন গেঁয়োখালী আমতলাটায় পৌঁছিয়েছি—আমাদের গ্রামের কোলে—তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেচে—জেলি আর প্রিয়-জেলের ছেলে আম কুড়ুচ্চে—একটি দরিদ্র যুবককে আগ্রহ সহকারে আম কুড়ুতে দেখে চোখে জল এল। কি দিয়েচে জীবন এদের? অথচ এরা মহৎ, এদের দারিদ্র্যে এরা মহৎ হয়েচে। অতিরিক্ত ভোগ ও সাচ্ছল্যে জীবনের সরল ও বন্ধুর পথটাকে হারায় নি।—

স্নান সেরে এসে বকুলতলার ছায়ায় বসে ওপরের কথাগুলো লিখলাম। মাথার ওপর কেমন পাখীরা ডাকচে—ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল—আর একটা কি পাখী—পিড়িং পিড়িং করে ডাকচে, কত কি অস্ফুট কলকাকলী—কি ভালই লাগে এদের বুলি।…

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ

বসলুম। শিমূল-গাছের এত অপরূপ শোভা তা তো জানতাম না। ঝোপের মাথায় মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্য্যের ভারে—চারিধারে চেয়ে—এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম-প্রান্তরে সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন-বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হল ওদের সঙ্গে কতদিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আতুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুণের,—কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা-পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লীবালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরাজ বালক-বালিকার, গাং-চিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—**Cape Wan**-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি—কত কি, কত কি।

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত—শান্ত সন্ধ্যা—কেউ নেই ঘাটে, ওপারের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেচে—একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর—কোনো অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের ঊর্দ্ধে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলচে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি, ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ—কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না—বিশেষ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন বৈকালগুলি—যেদিন সূর্য্য অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোকটুকু পর্য্যন্ত বড় গাছের মগ্ ডালে হালকা সিঁদুরের পোঁচের মত দেখা যায়—সেদিনের বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা আলো, ডাঁশা খেজুর ও বিল্বপুষ্পের অপূর্ব্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরনের পাখী-ডাকা, মিষ্ট সে বৈকালগুলিতে এমন সব অদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়, দু-একটা পাখী ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে—কি উদাস, করুণ হয়ে ওঠে তখন চারিদিকের ছবিটা, বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুমাদের বেলতলাটায় গিয়ে খানিকক্ষণ

বসেছিলাম, তখন—তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, কিন্তু এখনও বিল্বপুষ্পের গন্ধ সর্ব্বত্র, পাখীর ডাকের তো কথাই নেই—সোঁদালিফুল এখনও আছে, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আসবার পথে লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্চে।

এ সৌন্দর্য্য ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম, যত স্থানে বেড়িয়েচি, আনন্দ সব চেয়ে বেশী গাঢ় ও উদাস ভাবে আমি পাচ্চি শুধু এই এখানে—কোনো **Cosmic thoughts** আটকায় না, বরং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়—খুব ভাল করে ফোটে। তবে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানে কোনো শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখলুম। বিকেল হতে না হতে কেবল মন আনচান্ করে—রাত্রিতে কাজে মন বসে না—এ যেন **Land of Lotus-eaters.** কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্চি দু-একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলো একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখীর ডাকে ভরপুর আর বৈকাল তো ওইরকম স্বর্গীয়, এ পৃথিবীর নয় যেন—তবে আর লিখি কখন?

মনে মনে তুলনা করে দেখলুন এ ধরনের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখি নি—এই তো পাশেই চালকী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে নেই, এ ধরনের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই, বনজঙ্গল বড় বেশী, কাজেই অন্ধকার—এমন চাপা আলোটা হয় না—এ একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এতদিন তত লক্ষ্য করি নি, কাল লক্ষ্য করে দেখে মনে হল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখি নি তো! দেখবোও না—কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইলপুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে—সে অন্য ধরনের প্রাচুর্য্য, বৈচিত্র্য ও কারুকার্য্য কম—বিপুলতা বেশী, প্রখরতা বেশী।

ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরনের পাখী, বিশেষ ধরনের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরনের গাছপালা থাকাতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরনের বৈকাল সম্ভব হয়েচে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড় সম্পদ, মাঠে, বনে ওর ঝাড় যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়—বনদেবীর সাজির একটা অযত্নচরিত বনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেচে—তা আর কোনো ফুলে দেখলাম না

এই সুন্দর দেশে বাস করেও যারা মানসিক কষ্ট পাচ্ছে, আমার সইমার মত—তাদের সে কষ্ট সম্ভব হচ্চে শুধু অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জন্য। মনের সাহস এদেশটা হারাতে বসেচে—কল্পনার উদারতা নেই, সুদৃঢ় বিস্তীর্ণতা নেই—দৃষ্টি সেকেলে ও একপেশে, তার ওপর মনের মধ্যে জ্বলে নি জ্ঞানের বাতি। এত করে সইমাকে বোঝাই, সে শিক্ষা সইমা নেয় না, নিতে পারবেও না—কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝার প্রচলিত কতকগুলো **False Philosophy** এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদের মনের সর্ব্বনাশ করেচে। জীবনের সহজ দর্শন এদের নেই, বুড়ো বয়সেও ভাল করে এখনও চোখ ফোটেনি—কি করা যায় এদের জন্যে, সর্ব্বদাই সে কথা ভাবি। শিক্ষা দ্বারা মানুষ নিজেকে নিজে পায়, এইটাই জীবনের বড় লাভ। ভগবানকে পাবার আগে নিজেকে লাভ করা যে আবশ্যক তা এরা ভুলে গিয়ে শুধু ভগবান, ভগবান বলে নাকে কাঁদতে থাকে, নিতান্ত দুর্ব্বল জড়মতির মত! "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এ কথা এরা শোনেও নি কোনোদিন।

সারা পল্লী-অঞ্চলগুলো এমন হয়ে আছে, এদের দুঃখ দূর করতে গেলে তো জঙ্গল কাটালে হবে না, মশা তাড়ালেও হবে না—(সেটা যে অনাবশ্যক, তা আমি বলচি না) মাসিক কিছু অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করলেও হবে না—এর জন্যে চাই জ্ঞানের আলো—উদার, বিপুল, দীপ্ত জ্ঞানের সার্চ্চ-লাইট।

আজ অনেকক্ষণ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। সেকালের

অনেক কথা হল। ওই সবই আমার জানবার বড় ইচ্ছে। ঠাকুমাদের চণ্ডীমণ্ডপের ভিটাতে দুর্গোৎসব হত, বড় উঠোন ছিল—আন্নাপিসি দুবেলা গোবর দিতেন, খুব লোকজন খেত—নারকেল গাছের পাশে ওই যে সুঁড়ি গলিটা ছিল খিড়কির দোর—মেটে পাঁচিল ছিল ওদিকটা। গোলক চাটুয্যে ছিল বাবার মামাতো ভাই—পিসিমার মা ছিলেন ব্রত চাটুর্য্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুয্যের মেয়ে। প্রসঙ্গত বলা যাক যে আজই রাখালী পিসিমার মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেল। যাবো যাবো করে আর ঘটে উঠল না। পিসিমার শ্বশুরবাড়ি ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ রাখালী পিসিমার ভাই, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল—কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে। সইমাদের বাড়িতে আসার সময় ওই পথটাতে প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ নাকি ছিল—তার তলায় অনেক লোক বসতো। হরি ঠাকুরদাদা তার মাকে খেতে দিতেন না, মায়ের সঙ্গে ভিন্ন ছিলেন, তার দেওর গোসাঁই-বাড়ি ঠাকুরপূজো করে দু-পাঁচ টাকা যা জমাতো, তাই দিয়ে দরিদ্র বৃদ্ধাকে ধান কিনে দিয়ে যেতো।

বৈকালে নলে জেলের নৌকোতে বেড়াতে গেলুম মোল্লাহাটির দিকে। ছ'টার সময় আমাদের ঘাট থেকে নৌকোখানা ছাড়া হল। নদীর দুধারে অপরূপ শোভা, কোথাও বাবলা গাছ ফুলের ভারে নত হয়ে নদীর দুধারে ঝুঁকে আছে, দুধারে ঘাস-ভরা নির্জ্জন মাঠ, ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, গাঙ্ শালিকের দল কিচ্-কিচ্ করচে, বাঁ ধারে ক্রমাগত জলের ধারে ধারে নলবন, ওকড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ—মাঝে মাঝে চাষীদের পটোল ক্ষেত, বেলডাঙার ঘোষেরা যে নতুন ক্ষেতটাতে পটোল করেচে, তাতে টোকা মাথায় উত্তুরের মজুরেরা নিড়েন দিচ্চে, ওদিকে কুমড়োর ক্ষেত—চালু সবুজ ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁয়ে আছে, গরু চরছে, বাঁকের মোড়ে দূরে খাব্‌রাপোতা গ্রামের বাঁশবন, সুবৃহৎ lyre পক্ষীর পুচ্ছদেশের

মত নতুন বাঁশের আগা—একটু একটু রোদ মাখা। নদীজলের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বেরুচ্চে, মাথার ওপরকার আকাশ ঘন নীল, পশ্চিম দিগন্তে গ্রামসীমায় শিমূল, কদম গাছের মাথায় মাথায় অপরূপ মেঘস্তূপ, মেঘের পর্ব্বত—মেঘের গিরিবর্ত্মের ফাঁকটা দিয়ে অস্তসূর্য্যের ওপারের দেশের খানিকটা যেন দেখা যায়।

খানিকটা গিয়ে একধারের পাড় খুব উঁচু, বন্য নিমগাছের সারি, পাড়ের ধারে গাঙ্ শালিকের গর্ত্ত, নীল মাছরাঙা পাখী শেওলার ধারে ধারে মাছ খুঁজতে খুঁজতে একবার ওঠে, একবার বসে—খেজুর গাছ, গাবভেরাণ্ডা, বৈঁচি, ফুলে ভর্ত্তি সাঁই বাবলা, আকন্দের ঝোপ, জলের ধারের নলবন, কাশ, ষাঁড়া নোনা, গুলঞ্চলতা-দোলানো শিমূল গাছ, শালিক পাখী, খেঁকশিয়ালী, বাঁশঝাড়, উইঢিবি, বনমূলোর ঝাড়, বকের দল, উঁচু ডালে চিলের বাস, উলুঘাস, টোপাপানার দাম। সামনেই কাঁচিকাটার খেয়াঘাট, দুখানা ছোট চালাঘর, জনকতক লোক পারের অপেক্ষায় বসে—ডানধারের আকাশটায় অপূর্ব্ব হীরাকসের রঙ্ ধরেচে—গাঢ় নীল।

আবার দুপাড় নির্জ্জন, এক এক স্থানে নৌকা তীরের এত নিকট দিয়ে যাচ্ছে যে কেলেকোঁড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। বেলা আরও পড়ে এল, চারিদিকে শোভা অপরূপ, লিখে তা প্রকাশ করা যাবে না, ডাইনে ঘন সবুজ ঘাসের মাঠ, বামে আবার উঁচু পাড়, আবার বাবলা গাছ, শিমূলগাছ, ষাঁড়া গাছ, পাখীর দল শেষ-বেলায় ঝোপে ঝোপে কলরব করচে—দূরে গ্রামের মাথায় মেঘস্তূপটা পেছনে পড়েচে—এক এক স্থানে নদী-জল ঘোর কালো, নিথর কলার পাতার মত পড়ে আছে—দেখাচ্চে যেন গহন, গভীর অতলস্পর্শ। বাঁকটা ঘুরেই অনেকখানি আকাশ এক সঙ্গে দেখা যাচ্চে, পশ্চিম আকাশের কোলে যেন আগুন লেগেচে—অনেকখানি দূর পর্য্যন্ত মেঘে, আকাশে, গাছের মাথায় মাথায় যেন সে আগুনের আভা, খাব্রা-পোতার ঘাটের পাশে কোন দরিদ্র কৃষক-বধূ জলের ধারের কাঁচড়াদাম শাক কোঁচড় ভরে তুলচে আর মাঝে মাঝে সলজ্জভাবে আমাদের নৌকোর দিকে

চাইচে।

আরও খানিকদূর গেলাম, আবার সেই নির্জ্জনতা, কোথাও লোক নেই, জন নেই, ঘরবাড়ি নেই, শুধু মাথার ওপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়াচ্ছন্ন আকাশ আর নীচে সেই মাঠ ও গাছপালা দুধারে। বুড়ো ছকু মাঝি ছেলে সঙ্গে নিয়ে দুখানা ডিঙি দোয়াড়ি বোঝাই দিয়ে চুর্ণি নদীতে মাছ ধরতে যাচ্চে, তিন দিনে সেখানে পৌঁছুবে বললে। একদিকে বললে! একদিকে ঘন সবুজ কাঁচা কষাড়ের বন, নীচু পাড়, জলের খানিকটা পর্য্যন্ত দাম-ঘাসে বোঝাই, কলমী শাক অজস্র, আর কলমীর দামে জলপিপি ও পানকৌড়ী বসে আছে। মাথার ওপরকার আকাশটা বেয়ে সবাইপুরের মাঠটার দিক থেকে খুব বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখী বাসায় ফিরচে, বোধ হয় জটেমারির বিল থেকে ফিরলো, পাঁচপোতার বাঁওড়ে যাবে। সেইখানটাতে আবার নলে মাঝি কাস্তে হাতে ঘাস কাটতে নামলো—কি অপরূপ শোভা, সামনে খাব্‌রাপোতার ঘাটটা—একটা শিমূল গাছের পিছনে আকাশে পাটকিলে রঙের মেঘদ্বীপ, চারিধারে এক অপূর্ব্ব শ্যামলতা, কি শ্রী, কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, কি অপূর্ব্ব আনন্দেই মন ভরিয়ে তোলে—নলে কাস্তে হাতে ঘাস কাটচে—কাঁচা কষাড়ের মিষ্ট, সরস জোলা গন্ধ বার হচ্চে, আমি শুধু হেলান দিয়ে বসে দূরের আকাশটা ও গাছপালার দিকে চেয়ে আছি।

জীবনটাকে উপভোগ করতে জানতে হয়। মাত্র আট আনা খরচ হল—তাই কি? তার বদলে আজ বৈকালে যে অপূর্ব্ব সম্পদ পেলাম, তার দাম দেয় কে? আমাদের গ্রামের কেউ আসতো পয়সা খরচ করে খামোকা নৌকোয় বেড়াতে? কেউ গ্রাহ্য করে এই অপরূপ বনশোভা, এই অস্তদিগন্তের ইন্দ্রজাল, এই পাখীর দল, এই মোহিনী সন্ধ্যা? ··কেউ না। এই যে সৌন্দর্য্যে দিশাহারা হয়ে পড়চি, মুগ্ধ, বিস্মিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচি—এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা কেউ চোখ খুলে চায়?···আমি এসব করি বলে হয়তো আমাকে পাগল ভাবে।···

যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ দিন দিন এত কমে যাচ্চে, সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়। শহর-বাজারের কথা বাদ দিলাম, এইসব পাড়াগাঁয়ে যেখানে আসল জাতিটা বাস করে, সেখানকার এই কুশ্রী জীবনযাত্রার প্রণালী, দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা, এই শিল্পবোধের অভাব মনকে বড় পীড়া দেয়।

এবার জ্যোৎস্না উঠলো—আজ শুক্লা একাদশী, নলবন বাতাসে দুলচে, জ্যোৎস্না পড়ে দুপাশের নদীজল চিক্-চিক্ করচে। ঘাসের আঁটি বেঁধে নিয়ে নলে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

এত পাখী, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এ সব যেন আমারই জন্যে সৃষ্ট হয়েচে। এদেশেই তো এসব ছিল এতদিন, কেউ তো দেখে নি, কেউ তো ভোগ করে নি—কতকাল পরে আমি এদের বুঝলাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম—এই জ্যোস্না, এই আকাশ, এই অপূর্ব্ব ইছামতী নদী আমারই জন্য তৈরী হয়েচে!

অনেক দিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এই রৌদ্রদীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু-ডাকা বনানী, উষ্ণমণ্ডলের এই অপূর্ব্ব বন-সম্পদ, স্বচ্ছ জলের মধ্যে সন্তরণশীল মৎস্যরাজি, নির্ম্মেঘ নীল আকাশ—আমার শিরায়-শিরায় কেমন একপ্রকার মাদকতার সৃষ্টি করল।

একটি ছেলের ছবি মনে এল—সে এমনি Tropics-এর শ্যামল সৌন্দর্য্য, রৌদ্রকরোজ্জ্বলা পৃথ্বী, নীল দিক্‌চক্রবালের উদার প্রখরতার মধ্যে এই জলধারা পান ক'রে, দিনরাত গায়ক পাখীদের কাকলী শুনে শৈশবে মানুষ হয়েছিল—গ্রামের কত দুঃখ-দারিদ্র্য, কত বেদনা কত আনন্দ, কত আশা, কত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। সে মানুষ হয়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছপালা, লতা, পাখী, ফুলফল, সূর্য্য—এদের—এরাই তাকে কবি করেছিল!

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়ে এলুম—তারপর গেলুম জটেমারির পুলটাতে। ঝির্-

ঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর এক বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, এমন এক অপূর্ব্ব আনন্দে মন ভরে উঠল, সারা গা এমন শিউরে উঠল—সে পুলকের, সে উল্লাসের তুলনা হয় না—গত কয়েক মাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ওরকম আনন্দ পাই নি।

আজ চলে যাবো, তাই বিদায় নিলুম—বিদায় জ্যাঠামশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইছামতী, আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না, আর দেখা হবে কিনা তাও জানি না, কিন্তু তোমার ফলে জলে পুষ্ট হয়েচি, তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্যে এমন স্বপ্ন-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিলে দশ বৎসরের বালকের চোখে, তোমার গাছপালার ছায়াতলে, তোমার পাখীর কত-কাকলীত জীবন-নাট্যের অঙ্ক শুরু, বিদায় বিদায়—যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুলবো?

মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হচ্চে, হয়তো দু হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ঈজিপ্টে, যেখানে নলখাগ্ড়ার বনে, শ্যামল নীল (**Nile**) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবদের দলে এক অপূর্ব্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে আবার যাটটি বছরের জন্যে এসেচি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই-বোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে? এই **Cycle of Birth and Death** যিনি নিয়ন্ত্রিত করচেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি—তিনি এক বড় শিল্পী। এই সকল জন্মের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়তো কোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়বে—সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা।

কে জানে যে আবার এ পৃথিবীতেই জন্মাবো। ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথার সবে উঠেছে—ওর চারি পাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘুরচে, তার জগতে যেতে পারি—বহু বছরের **Globular cluster**-দের জগতে যেতে পারি—কে বলবে এসব শুধুই কল্পনা-

বিলাস? এ যে হয় না তা কে জানে? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব—বৃহত্তর জীবন-চক্র যুগে যুগে কোন অদৃশ্য দেবতার হাতে এ ভাবেই আবর্ত্তিত হচ্চে।

শত শত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ—জয় হউক সে দেবতার, তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময় হউক, নিত্যসৃষ্টি জীয়মান হউক—তাঁর প্রাণ-চক্রের নিত্য আবর্ত্তনশীল বিশাল পরিধিতে।

গুন্ গুন্ বানিয়ে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল :—

'গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে
হে অজানা অনন্ত—'

নিজেকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় স্রষ্টা।

হঠাৎ সারা দেহ এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠল—ওপারে মাধবপুরের বটগাছের সারি, বেলেডাঙ্গার গ্রামের বেণুবনশীর্ষ সান্ধ্য বাতাসে দুলছে, আউশধানের ক্ষেতের আইল পথ বেয়ে কৃষক-বধু মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসছে, আইনদ্দি মোড়লের বাড়ির মাথায় শুক্রতারা উঠেচে—মনে হল আমি দীন নয়, দুঃখী নয়, ক্ষুদ্র নয়, মোহগ্রস্ত জড় মানব নয়, আমি জন্ম-জন্মান্তরের পথিক-আত্মা। দূর থেকে কোন সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে আমার গতি—এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, এই সহস্র সহস্র শতাব্দী—আমার পায়ে চলার পথ, নিঃসীম শূন্য বেয়ে সে গতি আমার ও সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হোক।

মনে হল আর এক আজন্ম পথিক-দেবতার কথা, তাঁর কথা আমার এক খাতার লিখেচি। আমার সে কল্পনা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার দৃষ্টিতে আমি তা দেখেচি, আমার কাছে সেটা মহাসত্য—**revelation** চিন্তা ও কল্পনার আলোক যা দেখা যায়—তাকে আমি মিথ্যা বলে ভাবতে পারি না।

বিদায়, বিদায়—আর কখনো অজয়ের সঙ্গে দেখা হল না, গুরুজীর সঙ্গে দেখা হল না, কথক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল না, দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হল না—অনেকদিন পরে অজয়ের সেই শৈশবে-শোনা গানটা যেন কোথায় বসে গাচ্চে মনে পড়ে।

'চরণ বৈ মধু বিন্দতি'—চলা-দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।

দেশে থেকে এসে আজ একেবারেই ভাল লাগচে না। বৈকাল-গুলির জন্যে মন কেমন করচে, কুঠীর মাঠের জন্যে, খুকীর জন্যে, ইছামতীর জন্যে ফণি-কাকার জন্যে—সকলের জন্যেই মন কেমন হয়েচে। ছেলেবেলায় দেশে থেকে বোর্ডিং-এ ফিরলে এমনটি হত, অনেক কাল পরে মানস ইতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

কাল কলকাতাটা যেন নতুন নতুন লাগছিল—যেন এ কোন্ শহর—এক কর্ম্মব্যস্ত চেহারাতে আমিই কেমন অবাক হয়ে গেলাম, আনন্দবাজার পত্রিকায় ওই গলিটি, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট সব তাতেই লোকে একটা কিছু করচে—ব্যস্ত, ক্ষিপ্র, ছুটচে, বাস্ থেকে নামচে—দেশের মানুষদের সে মৃতের মত জড়তা অলস ও কর্ম্মকুণ্ঠতার পরে এসব যেন নতুন লাগল।

দিনটি কাটল বেশ ভালোই। সকালে উঠে সজনীর সঙ্গে গেলুম কাঁচরাপাড়া, সেখানে থেকে বড়-জাগুলে হয়ে মরিচা। এত ঘন বন যে কলকাতার এত কাছে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না। সেখানে গিয়ে ঔষধ সংগ্রহ করে কাঁচরাপাড়ায় এলাম। বাস রিজার্ভ করে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আসা গেল কাঁচরাপাড়া মাঠের মধ্য দিয়ে মোহিত মজুমদারের কাছে। মোহিতবাবু শোনা গেল শা'গঞ্জ গিয়েছেন। কাঁচরাপাড়া বাজারে একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে বাসে করে এলুম হালিসহর খেয়া-ঘাটে।

ঘাটে অনেকদিন আগে দিদিমা থাকতে একবার সর্ব্বপ্রথম এসে-ছিলুম, কেওটা-হালিসহরে থাকত।

মোহিতবাবুর ওখানে খাওয়া-দাওয়া হল ; অনেকক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষ করে বর্ত্তমান তরুণ-সাহিত্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হল। ভদ্রলোক প্রকৃত কবি, সাহিত্যই দেখলুম ওঁর প্রাণ, কবিতা পড়তে বসে যখন ছেলেমেয়েরা তাঁর কোল থেকে টানাটানি করে রসগোল্লা খেতে লাগল—তখন সে কি দৃশ্যই হল !

বেরিয়ে আমি আর মোহিতবাবু কেওটায় প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালার খুঁজতে খুঁজতে গেলুম। সে জায়গাটা এখন একটা পোড়ো ভিটে ও জঙ্গল—কোণের সে জামরুল গাছটা এখনও আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জামরুল গাছটা চেনা যাচ্ছিল না—মোহিতবাবু কাছে গিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এটা জামরুল গাছই বটে। জামরুল পেকে আছে।

তারপর রাখাল চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলুম। পুলিন তাঁর ছেলে। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় পড়েচি—এখন ও হট্ পা লম্বা, কালো গোঁপ-দাড়িওয়ালা মানুষ। ওর সঙ্গে কথা বললুম প্রায় ত্রিশ বছর পরে। শেষ কবে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কে জানে ?

রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতরের রোয়াক দিয়ে ওদের রান্না ঘরের রোয়াকে বসে মাসিমার সঙ্গে কথা বললুম। শেষ কবে কথা বলেছিলাম, কবে ওদের রোয়াকে পা দিয়েছিলাম, হয়তো তখন আমরা কেওটাতে ছিলাম—তারপর হয়তো শীতলের মায়ের গল্প বলা, কি আতুরীর কাছে ধামা-কুলো বেচার ঘটনাটা—যা আমার কেওটা সম্পর্কে মনে আছে, ঘটেছিল। তারপরে এক বিরাট আনন্দ, আলাপ, রহস্য, উল্লাস দুঃখ, হর্ষ, শোক, আলোক-পূর্ণ—বিরাট জীবন কেটেচে—পটপটি তলার মেলায়, বকুলতার দিনগুলোতে, পুব-মুখো যাওয়ায়, ইছামতীর ধারের সে অপূর্ব্ব শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি—সেই কতদিন স্কুল থেকে সপ্তাহ পরে ফিরে এসে মায়ের হাতে চৈত্র মাসের দিনে বেলের পানা খাওয়া, তারপর স্কুল-কলেজ, বাইরের জীবনে যা কিছু ঘটেচে সবই ওর পরে। কালকার দিনটিতে আবার এতকাল

পরে পা দিলাম রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতরকার রোয়াকে বা পুলিনের সঙ্গে কথা কইলাম।

জীবনের অপূর্ব্বত্ব এই সব মুহূর্ত্তে কি অদ্ভুত, অপরূপ ভাবেই ধরা পড়ে যায়।

করুণা মামার বাবা যোগীনবাবু জানলা খুলে কথা কইলেন। তিনি আমাকে খুব চেনেন দেখলাম।

রাত আটটার বাসে হুগলী ঘাট এলাম। খুব পরিষ্কার আকাশ, খুব নক্ষত্র উঠেচে। রাত এগারোটায় কলকাতা ফেরা গেল।

সেই সকাল ছ'টায় বেরিয়ে কোথায় বড়-জাগুলে মরিচা, দুধারের ঘন জঙ্গল, কাঁচরাপাড়া বাজার, বাঁশের পুল, হালিসহরের খেয়াঘাট, কেওটা, হুগলী ঘাট, নৈহাটী—সব বেড়িয়ে ঘুরে আবার কলকাতা ফিরলাম সাড়ে এগারোটা রাত্রে। মোটর বাস ছিল বলেই একদিনে এত ঘোরাঘুরি, এমন সব অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সম্ভব হল।

রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ির পৈটায় বসে মোহিতবাবু 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কেওটায় সেই অশ্বত্থ্ গাছটার কাছে রাত আটটার সময় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সাহিত্য-মণ্ডলী গঠনের ও 'শনিবারের চিটি' অন্যভাবে বার করার জন্য খানিকটা পরামর্শ করা হল। কাজে কতদূর হয় বলা যায় না।

কাল মোহিতবাবু কলকাতায় এসেচেন সজনীবাবু লিখে পাঠালেন। বৈকালে গেলাম প্রবাসী আপিসে। সেখান থেকে বার হয়ে সকলে মিলে প্রথমে যাওয়া গেল ডঃ সুশীল দে-র বাড়ি। সেখানে ঢাকার বর্ত্তমান হাঙ্গামা ও ইউনিভার্সিটির গোলযোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হল। সজনীবাবুর ব্যক্তিগত কথাও অনেক উঠল—অনেকক্ষণ বসে সেখানে হাসি-গল্প হল, বেশ উপভোগ করা গেল—ডঃ দে আমার ঠিকানা চাইলে বিপদে পড়লাম—এ বাসাটা যদি না বদলাই তবে, বদলে ফেললে এ ঠিকানাটা দিয়েই বা লাভ কি?

সেখান থেকে বার হয়ে সবাই গেলাম কবি যতীন বাগচীর বাড়ি। মনোহরপুকুর রোড তো প্রথমে খুঁজেই বার করা দায়। ট্যাক্সি ছেড়ে

দিয়ে বালিগঞ্জ এ্যাভিনিউ বেয়ে আমরা রাত ন'টার সময় একবার এদিক, একবার ওদিক—সে মহামুশ্‌কিল। অনেক কষ্টে রাত দশটার সময় বাড়ি বেরুল। যতীনবাবু আমাদের দেখে খুব খুশী হলেন। মোহিতবাবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন; বললেন, 'অল্পদিনের মধ্যেই ইনি যশস্বী হয়ে উঠেচেন একখানা বই লিখে, **luck** আছে বলতে হবে।' আমি মনে মনে খুব খুশী হয়ে উঠলাম, যা-ই বলি। তারপর জল-টল খাওয়ার পরে সেখানে থেকে অনেক রাত্রে বাসায় ফেরা গেল।

আজও আবার তাই। প্রথমে কেদারবাবুর সঙ্গে এশিয়াটিকদের অকর্ম্মণ্যতা নিয়ে খানিক তর্ক-বিতর্ক হল। উনি বললেন, 'কেন, জঙ্গিস্ খাঁ কি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি?' আমি বললুন—সেটা **one man show** মাত্র, কোনো স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন কি?···প্রবাসী আপিস থেকে আমরা গেলুম অমল হোমের বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজব ও কবিতা আবৃত্তি হল। অমল হোমের স্ত্রী বললেন, 'একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, আপনার 'অপরাজিত' পড়ে—আমি তাঁকে ডাকি,—পাশের ঘরেই আছেন।'

মেয়রের নির্ব্বাচন সম্পর্কে অনেকগুলো নতুন কথা শুনলাম অমল হোমের মুখে—যতীন সেনগুপ্ত এবার মেয়র না হলে অনেকে দুঃখিত হবে বটে, কিন্তু মেয়র হলে লোকে তার চেয়েও দুঃখিত হবে। বাইরে চেয়ে দেখলাম আকাশে মেঘ করেচে—অনেকটা দূরের আকাশও দেখা যায়—দূরের কথা, দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এঁরা বেশ শিক্ষিতা মেয়ে, ধরণ-ধারণ এত মাজ্জিত ও মধুর যে এঁদের সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের—সইমা কি বুড়ি পিসিমা—এদের তুলনা করে হতাশ হতে হয়। একটা ভাঙা কড়া এক জায়গায় বসানো ছিল, বেরুবার সময় পায়ে এমন লাগল!

সেখান থেকে এলাম সুরেশবাবু বাড়ি। সেখানে হেম বাগচী ও সুবল বসে আছে। সুরেশবাবুর স্ত্রী চায়ের উদ্যোগ করতে আমরা

নিবৃত্ত করলাম—কেননা এইমাত্র অমল হোমের বাড়ি থেকে আমরা চা, পাঁপর ভাজা, বাদাম ভাজা ও রসগোল্লা খেয়ে আসচি। ফরাসী কবি বোদ্‌লেয়ার সম্বন্ধে খানিকটা কথাবার্ত্তা হল, মোহিতবাবু একটা লেখা পড়লেন—তারপর আমরা সবাই এলাম চলে। মোহিতবাবুর আবৃত্তি কি সুন্দর!

কি সুন্দর সন্ধ্যাটা কাটল!

* * *

আজ সকালে ধূর্জ্জটিবাবু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও সুরেশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে গল্পগুজবের পর আসাম মেলে রাণাঘাট এলাম ও সেখান থেকে সাড়ে তিনটার ট্রেনে দেশে এলাম। হাজারির মোটরটা দাঁড়িয়ে ছিল, সহজেই বাজার পর্য্যন্ত আসা গেল।

এসেই কাপড়-চোপড় ছেড়ে গামছা নিয়ে নদীতে গা ধোবার জন্য গেলাম। ভারি সুন্দর বৈকাল, আকাশের রঙ এমন সুন্দর শুধু বর্ষা-কালেই হয়। গাছপালার রঙ কি সবুজ—রৌদ্রের রঙটা কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের, কুঠীর মাঠে গেলাম—সেই শিমূলগাছটার গায়ে কি সুন্দর রৌদ্রই পড়েচে—চারি ধারে আকাশের রঙে বড় মুগ্ধ করলে।

আমাদের ভিটার পাশে যে গাছটা আছে, তার গায়ে খানিকটা হলদে রঙের রোদ লেগে দেখতে হয়েচে অদ্ভুত।

মাঠের চারিধারে সবুজ গাছপালা, আউশ ধানের সবুজ ক্ষেত, সুনীল আকাশ, এখনও বৌ কথা-ক' ডাকচে—খুব ডাকচে। সোঁদালি ফুল এখনও কিছু কিছু আছে।

* * *

কাল বৈকালে প্রথম গেলাম সুবলবাবুদের বাড়ি বাগবাজারে, সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পরে বিভূতিদের ওখানে গেলাম। বাগবাজার ট্রামে আসবার সময়ে মনে ভাবছিলাম সাতাশ বছর আগে এই বর্ষাকালে, তবে বোধ হয় এর আরও কিছু পরে—এই জায়গাটি দিয়ে ট্রামে করে যেতুম বাবার সঙ্গে। তখন আমি নিতান্ত বালক,

আর, আজ কেবলই মনে হচ্চে এই সময়ের পরে কলকাতা ছেড়ে দেশে গিয়ে সে কি অপূর্ব্ব জীবন-যাত্রা। কি বৈচিত্র্য! সে শুধু অনুভূতিতে ভরা—নানা ধরনের বিচিত্র বাল্য অনুভূতি! আসল জীবনটাই তো হল এই অনুভূতি নিয়ে, পুলক নিয়ে, উচ্ছ্বাস নিয়ে। আজও সেই গ্রাম আছে, নদী আছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব অনুভূতি আর নেই।

বিভূতিদের বাড়ি থেকে যখন আসি তখনও কেমন একটা শূন্যতার ভাব, যেন এদের বাড়ির সকলেই আছে—অথচ কি যেন নেই। সবাই কাছে এল, বসলে, গল্পগুজব করলে—কিন্তু কোথায় সেই ভাদ্র-মাসের বৈঠকখানা ঘরের দিনগুলা, সেই মক্কা-মদিনা যাত্রী তাকিয়া-বালিশ, সে আনন্দের ঢেউ? **Where is that child**?··সিধুবাবুও নেই—কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা।

পথে একটা মারামারি হচ্ছিল, পিকেটিং-কারী এক বালককে নাকি পুলিসে খুব মেরেচে, তাই নিয়ে। বাসে করে বায়স্কোপ দেখতে গেলাম ও সেখান থেকে অনেক রাত্রে এলাম ফিরে।

* * *

আজ রবিবাসরের অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আলাপ হল, 'অপরাজিত' তাঁর খুব ভাল লেগেচে বলছিলেন।

আজ ক'দিন থেকে মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ধরনের আনন্দ পাচ্ছি তা বলবার নয়, লিখে প্রকাশ করবার নয়—সে শুধু বুঝতে পারি—বোঝাতে পারি নে।

এইমাত্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দাটাতে একা বসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দু'-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে এই অপূর্ব্ব ভাবটাই মনে আসছিল· আনন্দ মানুষকে এত উচ্চেও ওঠাতে পারে! অমৃত বলে মনে হচ্চিল নিজেকে, সত্য বলে মনে হচ্চিল, বিরাট ও শাশ্বত বলে মনে হচ্চিল এক উন্মাদময়ী প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি! মুগ্ধ হয়ে গেলাম··

দু-একটা চরণ গান তৈরি করে গুন্‌গুন্ করে গাইলাম:

মনে আবার রঙ ধরেচে আবার সুরের আসা-যাওয়া,—

আজ ক'দিন থেকেই এরকমটা হচ্চে।

দিনগুলো যে ভয়ানক নিরানন্দ হয়ে উঠেচে এ কথায় কোনো ভুল নেই। এ শুধু হয়েচে সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত খাটুনির জন্যে। অনবরত পরের খাটুনি, নিজের জন্য এতটুকু ভাববার অবকাশ নেই, অবসর নেই, সকাল দশটা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা। মনের অবকাশ মানুষের জীবনের যে কত দরকারী জিনিস তা এই কর্ম্মব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত কর্ম্মঠ, হিসাবী ও সময়জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষেরা কিছু বুঝবে কি? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়, ভাল গাড়ি-ঘোড়া চড়ায়—অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে আরও জাগিয়ে নাচিয়ে তোলে—শক্ত করে বাঁচিয়ে রাখে, বেশ সুষ্ঠুভাবে ও কৃতীর সুনামে বাঁচিয়ে রাখে—কিন্তু ভারবাহী চোখে-ঠুলি বলদের থেকে কোনো পার্থক্যের গণ্ডী টেনে দেয় না—জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়,—টাকার গাছের আবাদ। প্রকৃতির শ্যামল বন্য সম্ভার, নীল আকাশ, পাখীর কূজন, নদীর কল মর্ম্মর, অস্ত-দিগন্তের সান্ধ্যমায়া—এ সব থেকে বহুদূরে, এক জনহীন, জলহীন বৃক্ষলতাহীন মরু। এদের দেশ-ভ্রমণেও যেতে দেখেচি ফার্স্ট'ক্লাস কামরায় চেপে, দশদিনের ভ্রমণে দুই হাজার টাকা ব্যয় করে, মোটরে করে যাবতীয় স্থান এক নিশ্বাসে বেড়িয়ে, বিলাতী হোটেলে খানা খেয়ে, হুইস্কি টেনে—সেও ঐ ভেড়ার দলের মত বেড়ানো।

আজ বসে বসে শুধু মনে হচ্চিল অনেকদিন আগে বাল্যের নবীন মধুর বর্ষার বৈকালগুলি—কি ছায়া পড়তো, কি পত্রপুষ্পের সুগন্ধ বেরুতো, কি পাখীর গান হত—জীবনের সম্পদ হল সে সব—এক মুহূর্ত্তে জীবনকে বাড়িয়ে তোলে, বৃদ্ধিশীল করে—আত্মার পুষ্টি ওখানে। ধ্যান অর্থাৎ **contemplation** চাই, আনন্দের অবকাশ চাই—তবে হল আত্মার পুষ্টি—টাকা রোজগারের ব্যস্ততায় দিনরাত কাটিয়ে দেওয়ায় নয়!

মানুষের জীবনে প্রকৃতি একটি মহাসম্পদ, এর সঙ্গে অসহযোগ

করলে জীবনটায় প্রসারতা কমে যায়, রোমান্স কমে যায়, **common place** হয়ে পড়ে নিতান্ত।

আমি নিজেই বুঝতে পারি, এই ভাদ্র মাসের ঠিক এই সময়কার ১৯২৭ সালের ডায়েরীগুলো যদি পড়া যায় তবেই দুই জীবনের আকাশ-পাতাল তফাৎটা ভালো করে বোঝা যাবে।

* * *

১৯২৫ সালে এই সময়ে বিভূতিকে পড়াতুম মনে আছে, সে এখন কত বড় হয়ে গিয়েছে—এখন আবার অন্য ছেলেদের পড়াই ঠিক এই সময়টিতে, সে-কথা হল আজ। এদের এখানে প্যাক-বাক্সের গন্ধ, ছেলেগুলোও দুষ্টু।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিলুম। একদিন উপেন-বাবুকে বলেছিলুম, বাল্যের অমুক দিনটা থেকে যদি জীবন আবার আরম্ভ হত···? আজও তাই ভাবি—জীবনের **experience** আমাদের খুব বেশী না,—সমৃদ্ধ খুব, একথা বলতে পারি না, অন্য অনেকের জীবনের তুলনায়। সামান্য একটু ভাগলপুর যাওয়া, সামান্য এক আবেষ্টনী, নতুন ধরণের জীবনের স্পর্শ, বড়লোকের বাড়ি—এই সব। কিন্তু এতেই আনন্দ এত বেশী দিয়েচে যে এ থেকে এই কথাটাই বার বার মনে হয়, যে নির্দিষ্ট পরিমাণের আনন্দ প্রত্যেকের মনেই ভগবান দিয়েচেন, যে কোন জিনিসকে উপলক্ষ্য করে হোক সেটা ব্যয়িত হবেই হবে।

অনন্ত জীবনে আরও কত অভিজ্ঞতা হবে, সেই কথাই ভাবি। আরও কত উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা, কত অপূর্ব্ব আনন্দের বার্ত্তা!

* * •

এ রবিবার দিনটাও একটা ট্রামের সারাদিনের টিকিট বন্ধুর ছেলে তরুকে দিয়ে কিনিয়ে আনলুম শিয়ালদহ থেকে। এদিন বেরোলুম সকাল সাড়ে ছ'টার সময়ে। প্রথমে উপেনবাবুর বাসা। সেখান থেকে গেলাম ভবানীপুর সোমনাথবাবুর বাড়িতে। খানিকটা গল্পগুজব করার পরে গেলাম প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি বালিগঞ্জে। তিনি আমার

বইখানা পড়ে খুব খুশী হয়ে আমার সঙ্গে পরিচিত হবার ঔৎসুক্য জানিয়েছিলেন, এ কথা সোমনাথবাবু আমাকে লেখেন—তাই এ যাওয়া। তিনি নাকি বলেচেন—**In Europe, he could have been a celebrity**; কিন্তু এখানে কে খাতির করবে?···তারপর আমার বইখানা সম্বন্ধে প্রমথবাবু নানা কথা বললেন—দেখলাম বইখানি খুব ভাল করে পড়েচেন। দুর্গার সিন্দুর-কৌটা চুরি ও সেটা কলসী থেকে বেরুনোর উল্লেখটা বার বার করলেন।

সোমনাথবাবু আমাকে এসে পার্ক সার্কাসে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন—বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে একটা ভারি লাভ হল বলে মনে করচি।'

ওখান থেকে এসে গেলাম রেবতীবাবুদের মেসে—খানিকটা গল্প-গুজব করার পরে গেলাম নন্দরাম সেনের গলি ও বাগবাজারে। তারপর হরি ঘোষের স্ট্রীটে কালোদের বাসাতে। দুপুর তখন দুটো, বাইরের ঘরে বুড়ো ছিল, খিনুও এখানে আছে দেখলাম—খিনু কাছে এসে বসলো, অনেক গল্পগুজব করলে। কালোর ছেলে এনে দেখালে। ঠিক যেন মায়ের পেটের বোনের মতো সরল ব্যবহার করলে। ভারি আনন্দ হলো দেখে। ওরা সবাই এল—শরবত করে আনলে খিনু—ভারি ভাল লাগল।

ওখান থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে দক্ষিণাবাবুর বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর জলযোগ হল। চা-পানের পর সেখান থেকে বার হয়ে নিকটেই মহিম হালদার স্ট্রীটে রবিবাসরের অধিবেশনে যোগ দিলাম—সেখানে বেলা পাঁচটা থেকে রাত ন'টা। অনেক রাত্রে ট্রামে বাসায় ফিরলাম।

আজকাল সেই মধুর দিনগুলি হারিয়ে গেছে—বহুদিন দেশে যাই নি—আজ বিকেলে স্কুলবাড়ির ছাদ থেকে বহুদূরের দিকে চেয়ে কতকাল আগের কথা মনে হচ্চিল—মনে হচ্চিল অনেককাল আগের সেই মাকাল ফল, পট্‌টির গাছের সময়টা এই—কত নতুন লতাপাতা গজিয়েচে—ভাদ্র দুপুরের খররৌদ্রে জানালার ধারে বসে সে-সব মধুর

জীবন-যাত্রার দিনগুলি—কত সুখদুঃখ-ভরা শৈশবের সে জগৎটা।··· কোথায় কতদূরে যে চলে গিয়েচে! আজকাল সময় পাই না, স্কুলের পরই পর পর দুটো ছেলে পড়ানো—একটুখানি ভাববার সময় পাই নে, দেখবার সময় পাই নে, তবু যতটুকু সময় পাই—দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় হাঁ করে যেন আকাশটার দিকে চেয়ে একটুখানি অপরাহ্ণকে স্কুলের তেতলার ছাদ থেকে দেখি—আবার সেই 'জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মাধবী কঙ্কণে'র দিনগুলি আগতপ্রায়। এখন দেশে পাটের আঁটি কাচবে, খুব পাঁকাটি পড়ে থাকবে। সেই জেলেখা, রঙমহাল শিসমহাল, শিবাজীর দিনগুলি আরম্ভ হবে। এই যে অভাব, না দেখতে পাওয়া, —আমাদের মনে হয় এই ভাল। এতে মনের তেজ খুব বাড়ে, দৃষ্টির **intensity** আরও বেশী হয় এটা বেশ বুঝি।

একটা কথা এই মাত্র ভাবছিলাম, রামায়ণ মহাভারতের যুগের পূর্ব্বে ভারতের বালকেরা বৃদ্ধেরা কি ভাবতো—তখন জীবনের ভাব-সম্পদ ছিল দীন—সীতার অশ্রুজল তখন ছিল লোকের অজ্ঞতা, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এ সব তো জানতো না। বুদ্ধের কথা বাদ দিলাম, অশোক, চৈতন্য, মোগল বাদশাহ্‌গণ—এই সমস্ত **Tragic possibility**, ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল লীন—তবে তখনকার লোকে কি ভাবতো, কবিদের, ভাবুকের, গায়কের, চিত্রকরের উপজীব্য ছিল কী?

আর পাঁচশত বছরের সম্ভাব্যতার কথা মনে উঠচে। আর কত **Tragedy**র বিষয়, ভাবুকতার ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এর মধ্যে। সেটা এখনই গড়ে উঠচে, কিন্তু আমরা তার সমস্তটা এক সঙ্গে দেখতে পাচ্চি নে। এই ইংরাজ চলে যাবে একদিন—এই সব স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই গান্ধী, নেহরু, চিত্তরঞ্জন, এই নারী-জাগরণ, কাঁথির এই অশ্রুতীর্থ—ইতিহাসে এসব কথা নব নব ভাবের জন্মদাত্রী হবে। এসব ঘটনা জাতির মনের মহাফেজখানায় অক্ষয় আসনের প্রতিষ্ঠা করবে।

* * *

কাল সারা দিনটা বড় ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটলো—প্রবাসী

আপিসে একটা কাজ ছিল। ঠিক বেলা বারোটার সময় সেখান থেকে বার হয়ে গেলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্রপরিষদে। নীহারবাবু বললেন, 'পথের পাঁচালীকে আমি তরুণ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ আসন দিই।' প্রমথবাবু আমার বইখানির কথা অনেক ছাত্রদের বলছিলেন। প্রতুল গুপ্ত বলে ছেলেটি বঙ্গ-সাহিত্যের বিজয়ী সেনাপতি বলে অভ্যর্থনা করলে। সোমনাথবাবু বললেন, 'আপনি বর্ত্তমান আধুনিকতম সাহিত্যের বড় ঔপন্যাসিক—আপনাকেও কিছু বলতে হবে।' খুব আনন্দে কাটল।

ওখান থেকে বার হয়ে যাবার কথা ছিল সাহিত্য-সেবক-সমিতির অধিবেশনে, কিন্তু তা আর যাওয়া সম্ভব হল না। প্রমথবাবুর সঙ্গে গল্প করতেই বেজে গেল নটা। অতুল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন—তিনি আমার বইখানার খুব প্রশংসা করলেন। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন ল' কলেজে। তাঁকে বললুম সে-কথা।

* * *

আজ একবার দুপুরে কাজে গিয়েছিলাম অক্ষয়বাবুদের বাড়িতে। শীতল একখানা হাতের লেখা মাসিক পত্র বার করচে, তাতে লেখা দিতে বলচে। কাল সে আসবে বেলা তিনটের সময়।

সেখান থেকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে ফিরলুম—বৈকাল ছটা। পূর্ব্বদিকের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসচে। শিয়ালদহের কাছটায় ট্রামটা এলেই আজকাল পূর্ব্বদিকে চাই। অন্যদিনও চাই, এমন হয় না—আজ যে কী অপূর্ব্ব মনে হল।···মাকাল ফল, পিসিমা, পুরনো বঙ্গবাসী, দুপুরের রৌদ্র, মাকাল গাছ, ঘুঘু পাখী, বাঁশবন—কত কথা যে এক মুহূর্ত্তে মনে এল! আমি এরকম আনন্দ একদিন মাত্র পেয়েছিলাম,—যেদিনটা স্কুলের ছাদ থেকে বহুদূরের আকাশটার দিকে চেয়েছিলাম এই সন্ধ্যা ছটার সময়ে।

তার পরে স্থুরি লেনের কাছে নেমে গেলাম রাজকৃষ্ণদের বাড়ি যাব বলে।

আমি শুধু প্রার্থনা করি, আমাকে আগে নিয়ে চল হে ভগবান—

যাতে সর্ব্বদা মন গতিশীল থাকে। কিসে মন বর্দ্ধিত হয়, তার সন্ধান তোমার জানা আছে, আমাদের নেই—তা ছাড়া আমার শিল্পী মন কি করে আরও পরিপুষ্ট হবে তার সন্ধান তুমিই জানো।

তোমার যে দিকে ইচ্ছা সে দিকেই নিয়ে যেও।

অবশেষে ঘুরিয়া যাওয়াই ঠিক করে কালকার বম্বে মেলে বার হয়ে পড়া গেল। দিনটা ছিল খুব ভাল—বৈকালের দিকে ট্রেনটা ছাড়ল—বর্ষাশেষে বাংলার এ অংশটায় শ্যামল-শ্রী দেখে বুঝতে পারলাম. বাংলা বাংলা করি বটে, কিন্তু দেশের সমগ্র পরিপূর্ণতাকে কখনো উপভোগ করি নি—কী অপূর্ব্ব অস্ত-আকাশের রঙীন মেঘস্তূপ, কী অপরূপ সন্ধ্যায় শ্যামছায়া! ···কোলাঘাটের যে এমন রূপ, তা আগে কে ভেবেছিল?—পিছন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দেশের ভিটা সেদিন দেখে এসেচি, তারই কথা মনে হল—সেই ঝিক্‌রে গাছগুলো সন্ধ্যার ছায়ায় বাল্যের আনন্দ-ভরা এক অপরাহ্নের ছায়াপাতে মধুর হয়ে উঠেচে এতক্ষণ—এই তো পূজার সময়. বাবা এতদিন বাড়ি এসেচেন, আমাদের পূজার কাপড় কেনা হয়ে গিয়েচে এতদিন—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রির উৎসবের সে সব আনন্দ—কি জানি কেন এই সব সময়েই তা বেশী করে মনে আসে।

সব সময় এই দেশের ভিটার ছবিটাই মনে উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেরণা দেয়—এ অতি অদ্ভুত ইতিহাস।

বিলাসপুর নেমে ঝড় বৃষ্টি। এখন একটু রৌদ্র উঠেচে—গাড়ির বসে বসে লিখচি—কিন্তু মেঘের ঘোর এখনও কাটে নি।

পরশু বৈকালটি সজনীবাবু, সুবলবাবু ও গোপালবাবুর সঙ্গে বেশ কেটেচে। প্রথমে রেস্টুরেণ্টে কিছু খেয়ে মোটরে করে গেলাম লেকে—সেখান থেকে আউট্রাম ঘাট—সেখানে চা-পানের পর বাসা। ডঃ সুশীল দে-র ওখানেও ঘণ্টা তিন-চার গল্প করে ভারি আনন্দ হল।

কারগী রোডে পৌঁছে দেখলাম কিছুই আসে নি, অতি বর্ষণের ফলে বন্যা হওয়াতে রাস্তা ভেঙে গিয়েচে—গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে দুই-তিন দিন লাগবে—আরও একটি সাহেব আমারই মত বিপন্ন হয়ে

পড়েচেন—সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তনই যুক্তিযুক্ত মনে হল। একজন বাঙালী ওভারসিয়ার ছিলেন, তাঁর নাম সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য—তিনি সঙ্গে করে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন—বেশ লোক।—ঝিঙে ও ঢেড়স ভাজা, ডাল ও ভাত।

ওধারকার রাঙা মাটির দেওয়াল, বেশ দেখতে। মনে হল ওরকম বাড়িতে আমি তো একেবারেই টিকতে পারবো না। সঙ্গে করে দেখালেন, পাশেই জমি কিনেচেন—সেখানে তরকারীর বাগান। একটি গালার কারখানায় নিয়ে গেলেন, গালা চোলাই হচ্চে—একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। সেখান থেকে এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে সামনের পাহাড়টাতে ওঠা গেল। ওপরে আর একটা পাহাড়—মধ্যে ঘন শাল পলাশের বন—মহিষের গলায় একটানা ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্চে। ওখানকার একজন খৃষ্টান ডাক্তার জানপান্নার বিবাহ গেল সেদিন, বিবাহ উপলক্ষে অনেকগুলি সাহেব, মেম ও বাঙালী খৃষ্টান মেয়ে এসেছিলেন এই ট্রেনে যাচ্চেন।

বিলাসপুরে গাড়ি পেয়ে গেলাম ঠিক মত—ভিড় খুব বেশী ছিল না। বিলাসপুরের ও রায়গড়ের মধ্যেকার অরণ্য ভূভাগের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব—কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে নামবার পরেই অধিকতর অপরূপ এমন আর এক বনভূমির ভিতর দিয়ে ট্রেন যেতে লাগল যার তুলনায় পূর্ব্বে যতগুলো দেখেচি সব ছোট হয়ে গেল—সেটা হচ্চে রায়গড় ও ঝারসাগুদার মধ্যে—সে অপরূপ অরণ্যভূমির বর্ণনা চলে না। দিবাশেষের ঘন ছায়ায় অনতিস্পষ্ট সে দৃশ্যের মত গভীর অন্য কোন দৃশ্য জীবনে দেখি নি কখনও—চন্দ্রনাথের পাহাড়েও নয়। কি প্রকাণ্ড পাহাড়টাই বরাবর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চক্রধরপুর পর্য্যন্ত এলো! ...মাঝে মাঝে সাদা মেঘগুলো পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে, যেন কুমোরেরা পণ পুড়ুচ্চে—নীল মেঘের মত পাহাড়টার শোভই বা কি! লোকে ভেবে দেখে না, মনের সতর্কতা কম, তাই সেদিন সেই লোকটা বললে, 'মশাই এ অঞ্চলে সবই **barren**'... **barren** কোথায়? তারা কি চক্রধরপুরের পরের এই গম্ভীর-দৃশ্য

বনানী দেখে নি ?···

আমি মনে মনে বুঝে নিলাম পিছনের ওই নীল পাহাড়টা, মেঘরাজি যার কোলে— সন্ধ্যাবেলাতে দুষ্টু ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়েচে —ওটা আর রেলের পিছনে মাঠগুলো নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজ তৈরী হয়েচে—দেড়শত দুইশত বর্গ মাইল পরিমাণের এই ত্রিভুজটার সবটাই বসতিবিরল, স্থানে স্থানে একেবারে জনহীন অরণ্য, পিছনে বরাবর ওই পাহাড়টা। এই অরণ্যভূমির ও শৈলমালার মধ্য দিয়ে রেল পথটা চলে গিয়েচে। সহসা একটা পাহাড়ের মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা শিখরদেশের কি অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা! গাড়ির সবাই বললে— ছাখো ছাখো—আমার তো হৃদয় বিস্ফারিত হল, চারিধারে এই অপূর্ব্ব বনভূমির শোভা দেখে অন্ধকার পর্ব্বত-সানুস্থিত অরণ্যের মধ্যে কোথা থেকে সন্থ ফোটা শেফালি ফুলের সুবাস পেলাম—ট্রেনটাও **Rock cutting**-টা ভেদ করে ঝড়ের বেগে ছুটেচে—চারিধারে রহস্যাবৃত অন্ধকারে ঢাকা সেই শৈলপ্রস্থ ও অরণ্য-ভূভাগ—জীবনে এ ধরনের দৃশ্য ক'টাই বা দেখেচি!···রাত আটটায় এসে বম্বে মেল ঝারসাগুদাতে দাঁড়াল। এখানে চা ও খাবার খেয়ে নিলাম। সেদিনকার মত উদার-হৃদয় সহচর তো আজ সঙ্গে নেই যে খাবার খাওয়াবেন।

ঝারসাগুদা থেকে সম্বলপুরে এক লাইন গিয়েচে। রাত্রে ট্রেনে বেশ ঘুম হল, সকালে এসে কলকাতায় উঠলুম—দুপুরটা ঘুম হল খুব।

আজ বিজয়া দশমী। কোথায় যাব—ভাবচি—বিভূতিদের ওখানেই যাওয়া যাবে এখন।

আজ সারা দিনটা হৈ হৈ করে কাটল। সকালে উঠেই সজনী-বাবুদের বাড়ি—সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর সকলে মিলে হিতেনবাবুদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে হল পিক্‌নিক্—মাংস সিদ্ধ হতে বাজল তিনটে। **Living age** কাগজখানাতে মেটারলিঙ্ক-এর নতুন বই **'Life of the Ants'**

সম্বন্ধে একটি ভারি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়ছিলাম—সামনের পাইকপাড়া রাজাদের বাগানবাটিতে অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া বর্ষাশেষের সরস, সবুজ গাছপালার উপর নেমে আসচে, ওধারের তালগাছগুলো মেঘশূন্য নীলাকাশের পটভূমিতে ওস্তাদ পটুয়ার হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবির মত মনোহর হয়ে উঠেচে—কিন্তু আমি এই বৈকালটিকে আমার মনের সঙ্গে কি জানি আজ মোটেই খাপ খাওয়াতে পারচি নে—আমার মনের সুসম্বন্ধ, সুনির্দ্দিষ্ট অপরাহ্নের মালায় আজকার বেলগেছিয়া বাগানের এই সুন্দর অপরাহ্নটি বিস্তৃত শত অপরাহ্ন-মুক্তাবলীর পাশে কেন যে স্থান দিতে পারলাম না, তা জানি না। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম শাঁখারিটোলায় রাধাকান্তদের বাড়ি, তারপর দক্ষিণা-বাবুদের বাড়ি। দক্ষিণাবাবু বাড়ি নেই। জ্যোৎস্না আদর-অভ্যর্থনা করলে, কাছে বসে খাওয়ালে। রাত এগারোটার পরে এলেন দক্ষিণা-বাবু। গল্পে-গুজবে রাত আড়াইটা—আজ আবার চন্দ্রগ্রহণ, কিন্তু মেঘের জন্যে কিছু দেখা গেল না। সারারাতের মধ্যে চোখের পাতা বুজানো গেল না মশায় ও গরমে—অনেকরাত্রে দেখি একটু একটু বৃষ্টি পড়চে।

*　　　*　　　*

এবার কালী পূজাতে দেশে গিয়ে সত্যই বড় আনন্দ পেলাম—এত সুন্দর গন্ধ বন-ঝোপ থেকে ওঠে হেমন্তের প্রথমে, এবার খুঁজে খুঁজে দেখলাম গন্ধটা প্রধানতঃ ওঠে বনমরিচার ফোটা ফুল থেকে ও কেলেকোঁড়ার ফুল থেকে। এবার আনন্দটা সত্যই অপূর্ব্ব ধরনের হল যা অনেকদিন কলকাতায় থেকে অনুভব করি নি। নৌকার ওপর বসে বসে যেন জীবনটা আর একটা **dimension**-এ বেড়ে উঠল—ঘন লতাপাতার সুগন্ধে বহু অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে—খুকী দ্বিতীয়ার দিন আমার সঙ্গে আবার গেল বারাকপুরে—সেদিন আবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। জাহ্নবী আমাকে ফোঁটা দিলে—খুকী দিলে খোকাকে। পরে আমরা দুজনে পাকা রাস্তার ওপরে বেড়াবো বলে বেরুলাম—কিন্তু যাওয়া হয়ে গেল একেবারে বারাকপুরে—গাছপালা,

প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে যে জীবন—তাই হয় সুখের, পরিপূর্ণ আনন্দের। এ আমি ভাল করে বুঝলাম সেদিন।

কয়দিন এখানে এসেও বেশ আনন্দেই কাটন—উষা দেবী এখানে এসেচেন ঢাকা থেকে, তাঁর ওখানে মধ্যে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করলুম—বেশ মেয়েটি—বেশ শিক্ষা আছে, সাহিত্য বিষয়ে সমঝদারও খুব সুন্দর। সুনীতিবাবুর বাড়িতে একদিন আমি ও সজনীবাবু গিয়ে—অনেকগুলো গ্রীক্ ও শক মুদ্রা, অনেক ছবি, আবুরাজ্যের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলো মূর্ত্তির ফটো—এই সব দেখে এলাম—প্রবাসী আপিসে আড্ডা যা চলচে ক'দিন, তাও খুব।

কাল জগদ্ধাত্রী পূজা—আমাদের চারদিন ছুটি আছে, রাত্রে গেলাম বিভূতিদের বাড়ি, অন্য অন্য বছরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—আজ কোথাও কিছু নেই—রাত ন'টার সময় অক্ষয়বাবু ছোট বৈঠকখানায় রেডিও শুনচেন—অন্য বছর যে সময় আগন্তুক ও নিমন্ত্রিতের ভিড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা সম্ভব হত না, কোথায় সে উৎসব গেল বাড়ির—যেন দীনহীন, মলিন সব ঘরগুলো, সিঁড়িটা, দালানটা। আমাকে অবশ্য খাওয়ার বিশেষ অনুরোধ করা ছিল—অক্ষয়বাবু ও খগেনবাবু বাইরে নিমন্ত্রণে গেল মেজ খোকাবাবুর বাড়ি। অনেক রাত্রে আমি, শীতল, বিভূতি একসঙ্গে বসে নিরামিষ ভোজ খেলাম। রাত বারোটাতে বাসায় ফিরলাম। শুয়েচি—চারিধার নিস্তব্ধ, নির্জ্জন। চাঁদটা পশ্চিম আকাশে নিষ্প্রভ হয়ে ঢলে পড়েচে—নক্ষত্রগুলো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়েচে, 'অপরাজিত'র অপুর বন্য-জীবনের গোড়াটা লিখচি - তাই বসে বসে ভেবে এই বিচিত্র জীবনধারার কথা মনে হল—ভারি আনন্দ পেলাম।

আজ জগদ্ধাত্রী পূজার সকালবেলাটি ; মনে পড়ে অনেক বছর আগে এই ঘরেই বসে বসে হাতির ছোট গল্প পড়তুম এইখানে। আজও সেই ঘরটি তেমনি নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কিন্তু পরিবর্ত্তনও কি কম

হয়েচে! তখনকার বিভূতি কত বড় হয়ে গিয়েচে—তখনকার সবাই কে কোথায় চলে গিয়েচে।

আগামী রবিবারে স্নুনীতিবাবু, অশোকবাবু, আমি ও সজনীবাবু—চারজনে মোটরে 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে যাওয়ার কথা আছে বৈকালের দিকে। দেখি কি হয়।

এইমাত্র মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তাঁর নব প্রকাশিত 'কিশলয়' বইখানা পাঠিয়েচেন, দেখলাম। খুব ভাল লাগল বইটি।

* * *

আজকের দিনটি বেশ ভাল কাটল। সকালের দিকে খুব মেঘ ছিল, কিন্তু তুপুরের পরে খুব রৌদ্র উঠল—তখন বেরিয়ে পড়া গেল—প্রবাসী আপিসে গিয়ে দেখি অশোকবাবু ও সজনী দাস বসে। চা পানের পরই সজনীবাবু গিয়ে গাড়ি করে স্নুনীতিবাবুকে উঠিয়ে নিয়ে এল—পরে আমরা রওনা হলাম আমাদের গ্রামে। সজনীবাবু, অশোকবাবু, স্নুনীতিবাবু আর আমি। যশোর রোডে এসে ব্যাটারির তারটা জ্বলে উঠে একটা অগ্নিকাণ্ড হত, কিন্তু স্নুনীতিবাবুর কুঁজোর জল দিয়ে সেটাকে থামানো গেল।

তারপরই খুব জোরে মোটর ছুটল—পথে মাঝে মাঝে রোদ, মাঝে মাঝে ছায়া—রোদই বেশি। আজ রবিবার, সাহেবরা কলকাতা থেকে বেড়াতে বেরিয়ে এক এক গাছতলায় মোটর রেখে ছায়ায় শুয়ে আছে।

তারপর পৌঁছে গেলাম জোড়া-বটতলায়। ওইখানে মোটরখানা রইল, কারণ দিনকয়েক আগে আমাদের গ্রামের দিকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পথে এখনও একটু একটু কাদা। নেমে কাঁচাপথটা বেয়ে বরাবর চললুম; স্নুনীতিবাবু কাঁচা কোসো কুল ও সেঁয়াকুল খেতে খেতে চললেন, অশোকবাবু ছড়ি কাটবার কথা বলতেই সজনীবাবু চটি ফেলে ছুটল গাড়িতে ছুরি আনতে। গ্রামে ঢুকবার আগে এ-ফুলের ও-ফুলের নাম সব বলে দিলাম—কাঁঠালতলায় হেলা গুঁড়িতে গিয়ে সবাই বসল। তারপরে সইমার বাড়ি গিয়ে কিছু মুড়ির ব্যবস্থা করে

একটা আসন পেতে সবাইকে বসালাম। সেখানে খাওয়া ও গল্প-গুজবের পরে আমাদের পোড়ো ভিটেটা দেখে রান্নাঘরের পোতা দিয়ে সবাই নেমে ঘন ছায়ায় ছায়ায় এলাম সলতেখাগী আমগাছের তলায় —সেই ময়না-কাঁটা গাছ থেকে ছড়ি কেটে নিলে অশোকবাবু ও সজনীবাবু—পরে তেঁতুলতলীর তলায় বনের মধ্যে দেখা গেল একটা খুব বড় ও ভাল ময়নাকাঁটা গাছ—সেখান থেকে আর একটা ছড়ি কাটা হল। তারপর প্রায় বেলা গেল দেখে আমি খুব তাড়াতাড়ি করলাম—ওদের বন থেকে টেনে বার করে নিয়ে গেলুম কুঠিটায়। ছেলেবেলায় গ্রামের জামাইদের ডেকে নিয়ে কুঠি দেখাতুম। তারপর সে কাজটা অনেকদিন বন্ধ ছিল—বহুকাল বন্ধ ছিল। শেষ কাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা তো মনে হয় না বহুকাল পরে বাল্যের সে কুঠি দেখানোর পুনরাবৃত্তিটা করলুম। তখন কুঠিটা আমার আছে খুব গর্ব্ব ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল—তাই যে কেউ নতুন লোক আসতো, তাকেই নিয়ে ছুটতাম কুঠি দেখাতে। আজ বহুদিন পরে সজনীবাবু ও সুনীতিবাবু ও অশোকবাবুকে নিয়ে গেলাম সেখানে। কুঠিতে কিছু নেই। আজকাল এত জঙ্গল হয়ে পড়েচে যে আমি নিজেই প্রথমটা ঠিক করতে পারলুম না কুঠিটা কোন জায়গায়।

তারপর মাঠ দিয়ে খানিকটা ছুটতে ছুটতে গেলাম। রাস্তায় পড়ে কাঁচিকাটার পুলে—এই কার্ত্তিকমাসেও একটা গাছে এক গাছ সোঁদালি ফুল দেখে বিস্মিত হলাম। সেইখানে ঝোপটি কি অন্ধকারই হয়েচে। সুনীতিবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন—সবাইকে ডেকে দেখালেন —আমার কেন মনে হচ্ছিল আমার পরিচিত সলতেখাগী তলায় যেখানে আমিই আজকাল কম যাই সেখানে—আমাদের ভিটেতে—সম্পূর্ণ কলকাতার মানুষ সুনীতিবাবু, অশোকবাবু, এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগছিল। আমাদের কুঠির মাঠে, আমাদের সইমার বাড়ির রোয়াকে!

সন্ধ্যা হলে তেঁতুলতলার পথটা দিয়ে সবাই মিলে আবার ফিরলাম —ময়না-কাঁটার ডালগুলো ওখান থেকে আবার নিলাম উঠিয়ে—

সইমার বাড়ি এসে দেখি হরেন এসে বসে আছে। সইমার সঙ্গে সুনীতিবাবুর খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল—পরে আমরা বার হয়ে গিরিশদার বাড়ি এসে গেলাম—তখনই ওদের রান্নাঘরের পৈঠাতে জ্যোৎস্না উঠে গিয়েচে।

তারপরে গাজিতলার পথ দিয়ে হেঁটে মোটর ধরলুম—গোপালনগরের হাট-ফেরতা লোক বসে আছে মোটর দেখবার জন্যে। খানকতক স্যাণ্ড্‌উইচ, ও ডালমুট কিছু খেয়ে নেওয়া গেল—কুঁজোর জল খেয়েটেয়ে গাড়ি স্টার্ট দেওয়া হল।

বঙ্কুর বাসায় এসে দেখি তরু • বেচারীর চৌদ্দ-পনের দিন-জ্বর—বিছানায় শুয়ে আছে, বঙ্কু ফোড়ায় শয্যাগত—বঙ্কুর বৌ এসেচে, কিন্তু সে বেচারীর দুর্দ্দশার সীমা নেই। সেখানে কিছু চা ও খাবার খাওয়ার পরে আমরা সুন্দর জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তায় সজোরে গাড়ি চালিয়ে রাত্রি সাড়ে ন'টাতে কলকাতার বাসায় এসে পৌঁছলাম। তখনও বাসায় খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হয় নি · ঠাকুর তখনও রুটি গড়চে। আমি এসে টেবিল পেতে লিখতে বসে গেলাম, আর ভাবছিলাম এই খানিক আগে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হল তখন ছিলুম আমাদের বাড়ির পিছনকার গাবতলার পথে—এরই মধ্যে কলকাতার বাসায় ফিরে এত সকাল-রাত্রে বারান্দার আলো জ্বেলে বসে লিখচি, এ কেমন হল?…

যদি মোটর না থাকতো তবে কখন পৌঁছাতাম?…সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে সন্ধ্যার গাড়ি ধরে, বা বনগ্রাম থেকে ট্রেন ধরে, রাত্রি বারোটাতে কলকাতা পৌঁছতাম।

আমি সত্যই আজ একটা আনন্দ পেলুম। একটা অদ্ভুত—ও সুন্দর ধরনের আনন্দ পেলুম! ওঁরা গিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে—আমি আমার পরিচিত ও প্রিয় স্থানগুলিতে কলকাতার এই প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে বেড়িয়ে আজ সত্যই একটা নতুন ধরনের আনন্দ পেলুম যা আর কোনো trip-এ পাই নি।

ইচ্ছা আছে বৈশাখ মাসের দিকে একবার এদিকে এসে ওঁদের

নিয়ে ইছামতীতে নৌকা ভ্রমণ ও কোনো একটা বনের ধারে বন-ভোজন করা হবে। সুনীতিবাবুও সে প্রস্তাব করলেন, সবাই তাতে রাজী।

কাল দুপুরে সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঠাকুরবাড়িতে ছিল নিমন্ত্রণ, সেখানে সকলের সঙ্গে গল্পগুজবে বেলা হল তিনটা, সেখান থেকে গেলুম 'গৈরিক পতাকা' দেখতে মনোমোহনে।

এ গেল কালকার কথা, কিন্তু আজ এমন অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েচি বৈকালের দিকে যে, মনে হচ্চে জীবনে ক—ত দিন এ রকম অদ্ভুত ধরনের বিষাদের ও উত্তেজনায় আনন্দ হয় নি আমার।

কিসে থেকে তা এল? অতি সামান্য কারণ থেকে। ক্লাসে দেবব্রত নাকি ছোট একটা খড়ি নিয়ে পকেটে রেখেছে, ক্লাসে মনিটার তার হাত মুচড়ে সেটা নিয়েচে কেড়ে। দেবব্রত এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললে, বললে, দেখুন স্যার, ওরা এত বড় বড় খড়ি নিয়ে যায় বাড়িতে আর আমি এইটুকু নিলাম। আমার হাত মুচড়ে ও কেড়ে নিলে?—হাতে এমন লেগেচে।

ছোট ছেলের এ কান্না মনে বাজল। তখনি অবশ্যি মনিটারকে বকে খড়িটুকু দেবব্রতকে ফেরত দেওয়ালাম, কিন্তু দুঃখটা আমার মনে রয়েই গেল।

সে কি অননুভূত দুঃখ ও বেদনা বোধ! দুপুরের রোদে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল ভগবান আমাকে এক অপূর্ব্ব ভাব-জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চান বুঝি। তিনিই হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায়, তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তিনিই জানেন। অনন্ত জীবনের কতটুকু আমাদের শান্ত-দৃষ্টির নাগালে ধরা দেয়? মনে হল বহুকাল আগে শৈশবে হরি ঠাকুরদাদা সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির দরজা থেকে চাল চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েচেন—সেইদিনটিতেই আমার এই ভাব-জীবনের বোধহয় আরম্ভ। তারও আগে মনে আছে—মা যেদিন অতি শৈশবে ছোলা ও মুড়ি খেতে দিয়ে দিদিমার কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তাঁর

গুরু এসেছিলেন, তিনি যে আমাদের জন্যে গুরুর পাতার মাছের ঝোল ও রুটি তুলে রেখে দিয়েছিলেন, মা তার খবর না জেনেই আমায় দিয়েছিলেন মুড়ি ও ছোলা ভাজা।—সেই ঘটনা থেকে মায়ের উপর এক অদ্ভুত স্নেহ ও বেদনা-বোধ—তার পরে জাহ্নবীর আমজরানো, পিসিমার শত দুঃখ, কামিনী পিসির কষ্ট, সেই যাত্রার দলের গান শেষ হওয়ার দিনগুলো—কত কি—কত কি ; তারপর বিভূতির কত কষ্ট ! আজ আবার দেবব্রতের কষ্ট—আমার সমগ্র ভাব-জীবনের সমষ্টি এই সব দুঃখ ও বেদনা, অবশ্য হয়তো অনেক দুঃখ বাস্তব, অনেকটা কাল্পনিক—কিন্তু আমার মনে তাদের জন্য বেদনানুভূতি আদৌ কাল্পনিক নয়—তাদের সার্থকতা সেখানেই।

যাক। তারপর স্কুলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। সন্ধ্যা হয়ে গেল. আমি ছাদে নীরব সান্ধ্য আকাশের তলে প্রতিদিনের মত পায়চারি করতে লাগলাম—মনে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দবোধ, সে আনন্দের তুলনা হয় না—ভেবে দেখলাম এই আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। কিসে থেকে তা আসে, সে কথা বিচারে কোনো সার্থকতা নেই আদৌ,—আনন্দ যে এসেচে, সেইটাই বড় কথা ও পরম সত্য। অনেক দিন পরে এ লেখা পড়ে আমারই মনের নিরানন্দ ও ভাবশূন্য মুহূর্ত্তে আমার মনে হতে পারে যে, এ দিনের আনন্দ একেবারেই অবাস্তব ও মনকে চোখ-ঠারা গোছের হয়তো—নিরানন্দের দিনে এ কথা মনে ওঠা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এই খাতায় কালির আঁচড়ে তা জানিয়ে দিতে চাই যে তা নয়, তা নয়। এ আনন্দ অপূর্ব্ব অননুভূত অতীন্দ্রিয়, মহনীয় !—এ ধরনের গভীর বেদনামিশ্রিত ভাবোপলব্ধি জীবনে খুব কম করেচি। করেচি হয়তো সে-দিন মালিপাড়ায় মাজু খাতুনের উপর পুলিশের অত্যাচার করার কথাটা খবরের কাগজে পড়বার দিনটা—তারপর অনেকদিন হয় নি।

সন্ধ্যার নিস্তব্ধ এ ধূসর আকাশের বহুদূর প্রান্তর আমাদের ভিটাটার কথা মনে হল একবার বেশ দেখতে পেলাম সেখানে ঘন ছায়া পড়ে এসেচে—বনে সুগন্ধ উঠচে হেমন্তের দিনে—সেই ভিট

থেকে একদিন পথে, ঘাটে, বৈকালের ছায়ায়, দুপুরের রোদে যে আনন্দ-জীবনের শুরু, আমি এই ভাবে মুগ্ধ হই, তা এখনও অটুট, অক্ষুণ্ণ রয়েচে—আরও পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে তার গতি নিত্য নবতর পথে।

আকাশের দিকে চাইলাম—মাথার উপর ধূসর আকাশে একটি নক্ষত্র মিট-মিট করচে। সঙ্গে সঙ্গে কালকার থিয়েটারে শোনা গানটা গাইলাম, 'জনতার মাঝে জনগণ প্রতি, বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন'। দেবব্রতের মত ক্ষুদ্র ও সুদর্শন এক দেবশিশুর ছবি মনে উঠল, ঐ ছবি বিশ্বের অজানা-অচেনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বালক তার অপূর্ব্ব শৈশব যাপন করচে আনন্দে সহাস্য কলরবে, দায়িত্বহীন কৌতুকের উচ্ছ্বাসে। তারপরে তার জীবনের সে সব বহুবর্ষব্যাপী বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ, সে গভীর বেদনাপূর্ণ ট্রাজেডি—কত যুগব্যাপী দুঃখ-সুখের শুরু—পৃথিবীর মানুষেরা যা কোনো দিন ধারণাই করতে পারে না। উঃ, সে কি অদ্ভুত অনুভূতিই হল যখন এ ছবি আমার মনে উঠল।

আজ বুঝলাম এই অনুভূতিই আসল জীবন। আমি নিরানন্দ দিনগুলিতে দেখেচি মন কিছুতেই আনন্দ পেতে চায় না—টেনেটুনে কত করে, কত নক্ষত্র জগৎ, এ, ও, নানা ব্যাপারের মধ্য দিয়ে জোর করে আনন্দ আনতে হয়, তা যাও বা একটু আধটু আনে—তাতেই তখন মনে হয়, না জানি কত বড় অনুভূতিই বা হল। কিন্তু আসল ও সত্যিকার আনন্দের মূহূর্ত্তে বোঝা যায় সে অনুভূতি ছিল অগভীর, মেকি, টেনে-বুনে আনা। আসল আনন্দকে জোর করে, মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আনতে হয় না তা আজ বুঝেচি—সে সহজ—অর্থাৎ **spontaneous.**

আরও অনুভূতি যার জীবনে না হয়েচে—অর্থের মানে, যশের প্রাচুর্য্যে তার দীনতা ঘোচাতে পারে না।

'অপরাজিত' উপন্যাসের বন-ভ্রমণ লিখচি আজ।

কাল স্কুল কমিটির মিটিং-এ ওরা সুবোধবাবুকে নোটিশ দিলে—

আমি আগে জানলে হতে দিতাম না—আমায় আগে ওরা জানায়ও নি, যদিও সাহেবের কোনো দোষ ছিল না, সাহেব আমাকে জানাবার কথা বলেছিল সুরেশবাবুকে। শেষকালে চেষ্টা করেও কিছু করা গেল না—বেচারীকে যেতেই হল। এই বেকার-সমস্যার দিনে একজন **Young man**-এর চাকরি এভাবে নেওয়া বড় খারাপ কাজ, মনে বড় কষ্ট হল···সুবোধবাবু মুখটি চুন করে বসলো কাল রাত্রে, কি করি আমার তো আর কোনো হাতই নেই।

আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পয়লা অগ্রহায়ণ, কিন্তু এত গরম যে সকালে কার্ত্তিক পূজার ছুটির দিনটা বলে রামপ্রসন্নর ওখানে বেড়াতে গেলাম। সেখানে সুরেশবাবুর আগ্রা ভ্রমণের গল্প শুনে ফিরে এসে, বেলা আটটার সময় এত গরম বোধ করতে লাগলাম যে, তাড়াতাড়ি নাইতে গেলাম—এবং মনে খুব আনন্দ হল, আরাম পেলুম, বালতির পর বালতি ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে লাগলাম—এত গরম!

এ সময়ে এত গরম আর কখনো কলকাতায় দেখেচি বলে তো মনে হয় না।

*　　　　*　　　　*

অনেকদিন লিখিনি—বাজে জিনিস না লেখাই ভাল, অন্ততঃ এ-খাতায়। আজ দুপুরটাতে কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, কবিশেখর কালিদাস রায় ও দক্ষিণাবাবুর বাড়ি—সেখান থেকে এসে বারান্দাতে বসেছিলাম, হঠাৎ মনে হল একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে **Wide World Magazine** দেখে আসি।

শাঁখারীটোলায় ভীমেদের বাড়িতে গেলাম, ওরা আজ নতুন খাতা করতে বেরিয়েচে। মোড়ের মাথায় টাটি একটা মুদীর দোকানে দাঁড়িয়ে হালখাতা করচে—তাকে ডেকে আদর করে ভারি আনন্দ পেলাম—তারপর নিউ মার্কেট ঘুরে এই মাত্র ফিরে আসচি। বেজায় গরম পড়েচে আজ কলকাতার।

জীবনের সৌন্দর্য্যের কথাই শুধু আজ ক'দিন ধরে ভাবচি। কি জানি কেন শুধুই মনে পড়চে ছেলেবেলায় যে টক এঁচড়ের চচ্চড়ি ও

টক কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতুম রান্না ঘরের দাওয়ায় বসে—
—সেই কথা। মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধের কথা। জীবনটার কথা ভাবলেই আনন্দে মুগ্ধ হতে হয়। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্ত্তন, এত রস, এত যাওয়া-আসা—ভেবে অবাক হয়ে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র ক্যাম্বেল স্কুলটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, মানুষ অনন্তের সন্তান—একথা মিথ্যা নয়, কে বলে মিথ্যা!··· সমগ্র নক্ষত্র জগতের জীবন—জরাহীন, মৃত্যুহীন, অপবাজেয় জীবনধারা তার নিজস্ব। সকল নক্ষত্রের পাশের দেশে—ওই যে নক্ষত্রটা আমার বারান্দার ওপর মিটিমিটি জ্বলচে—ওদের চারিপাশে আমাদের মত গ্রহরাজি আছে হয়তো—তাতেও জীব আছে, অন্য বিবর্ত্তনের প্রাণী হলেও তাদেরও সুখ-দুঃখ, শিল্প, অনুভূতি, মৃত্যু, প্রেম সবই আছে—দূরের নীহারিকা, **Golbular Cluster**-দের জগৎ, সে সব তো আলাদা বিশ্ব, তাতে তো অপূর্ব্ব অজ্ঞাত সব জীবনধারা—আমার জীবনও তো, কত দূর পথ চেয়ে কত অনন্ত সৌন্দর্য্যস্তম্ভের মধ্যে দিয়ে কাটবে তা কে জানে?··

এই বড় জীবনটা আমার···

মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পৌঁছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত। যদি যুগে যুগে আসি যাই তা হলেও তো ওরকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধ, কত টক কলাইয়ের ডাল আমার হবে।

কিন্তু প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্ম জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দ-ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্য্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনো শুকনো সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী—মৃত, মূর্চ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।

আইনস্টাইন্ বলেচেন—বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা; যে কোনো কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে মৃত, সে বেঁচে

নেই। আমাদের দেশের কেউ এ কথা বুঝবেন কি?

এই জন্যেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায় দেউলে হয়ে পড়ে—নতুন বিস্ময় নতুন অনুভূতি হয় না, নবতর জীবনের পথ চিরগুপ্ত রয়ে যায় তাদের কাছে—মানুষ দমে যায় জানি—কিছুকাল তার মনে সব শক্তি হয়তো ক্ষীণতর হতে পারে মানি—কিন্তু জীবন্ত যে মানুষ, সে আবার জেগে উঠবে, সে আবার নবতর বংশীধ্বনি শুনবে—নব জীবনের সন্ধান পাবে। অপরাজিত প্রাণ-ধারার কোন্ অদৃশ্য উৎসমুখ তার আবার খুলে যাবে, বি-জয় ও বি-মৃত্যু-আনন্দ তার চিরশ্যামল মনে আবার আসন পাতবে। বিহার অঞ্চলে দেখেছি শীতের শেষে বনে আগুন দেয়, সব ঘাস একেবারে পুড়িয়ে ফেলে—কি জন্যে? যাই জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র পড়বে—ওই দগ্ধ ঝোপ-ঝাপের গোড়া থেকে আবার নবীন, শ্যামল, সুকুমার তৃণরাজি উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রাচুর্য্যে বেড়ে উঠতে থাকবে—হু-হু করে বাড়ে, পনেরো দিনের মধ্যে সারা কালো গোটা ঘাসের বন ঘন শ্যামশ্রী ধরে—এই তো জীবন, এই তো অমরতা।

তাই ভাবি, মাস বছর ধরে মানুষের বয়স ঠিক করা কত ভুল। ১৩৩৮ সাল পড়ে গেল আজ, আমার বয়স এক বৎসর বেড়ে গেল বটে হিসেব মত—কিন্তু আমি কি দশ বৎসর কিংবা পনেরো বছর আগেকার সেই বালক নেই অল্পবিস্তর?...

সেদিন গেছলাম রাজপুরে অনেক কাল পরে। খিনুর সঙ্গে দেখা হল। আবার পুরনো পুকুরের পথটা ধরে হাঁটলাম—বাঁশগুলো নীচু হয়ে পড়ে আছে—চড়কের সন্ন্যাসীর দল বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। ছুটোর ট্রেনে ফিরে সাড়ে পাঁচটায় স্কুলের মিটিং করলুম। রসিদকে আজ তাড়ানো হল।

পথে কোন্ জায়গায় ফুটন্ত মালতীলতার ফুলের গন্ধ, জারমলীন আপিসের কাছে—গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের স্মৃতিটা হঠাৎ মনে পড়ল।

সেদিন বন্ধু বলছিল—বাঁকি-করিমালি। পরিচিত নাম, বাবার মুখে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম কবে—ভুলে গেছিলাম, যুগান্তর পরে

যেন কথাটা আবার শুনলাম বলে মনে হল।

অনেকদিন পরে আজ রবিবারটি বেশ কাটলো। শীঘ্রই গরমের ছুটি হবে, কাল রাত্রে বাইরের বারান্দায় বৃষ্টি পড়াতে বিছানা টানাটানি করে ভাল ঘুম হয় নি, উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে কলেজ স্কোয়ারের দোকানটাতে খাবার খেতে গেলুম—ওরা বেশ হালুয়া করে। তারপর গোলদীঘির মধ্যে বসে কামাতে লাগলুম একটা নাপিতের কাছে। ওদিকে অনেকগুলি গাছ, একটা গাছে সোঁদালি ফুল ফুটেচে—এমন একটা অপরূপ আনন্দ ও উত্তেজনা এল মনে, ফুটন্ত ফুলেভরা গাছটা দেখে—মনে হল আর বেশী দেরি নেই, এক সপ্তাহ পরে ঐ রকম ফুলেভরা বন-মাঠে গিয়ে 'অপরাজিত'-র শেষ অধ্যায়টা লিখবো—সত্যি, জীবনে দেখেচি ভবিষ্যতের ভাবনায় সব সময়ই এত আনন্দ পাই! ফিরে এসে অনেকক্ষণ বই লিখলুম। দুপুরে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল—ঘুম আদৌ হল না। বেলা আড়াইটার সময় দরজায় শব্দ শুনে খুলে দেখি নীরদবাবু। তাঁর গাড়ি নীচেই দাঁড়িয়েছিল—দুজনে উঠে একেবারে দমদমে সুশীলবাবুর বাগানে! সত্যি, ওদের সাহচর্য্য এত সুন্দর লাগে আমার—সত্যিকার প্রাণবন্ত সঙ্গীর মন ওদের। সেখানে বাইরের মাঠে চেয়ার পেতে বসে নানা বিষয়ের আলোচনা হল—চা-পান সমাপন হল। শান্তিনিকেতন থেকে অমিয় চক্রবর্ত্তী 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লিখেচেন, 'বই পড়ে গ্রামখানি দেখতে ইচ্ছা হয়'—আর লিখেচেন, 'শিল্পীর সৃষ্ট গ্রামখানি শাশ্বতকালের, জানি না ভৌগোলিক গ্রামখানা কি রকম দেখবো!'

ছটার সময় নীরদবাবুর গাড়ি করে ফিরলুম—কারণ রবিবাসর ছিল প্রেমোৎপলবাবুর বাড়িতে। আজ খুব মেঘ করেছে, দমদম থেকে আসতে মেঘান্ধকার পুব-আকাশের দিকে চেয়ে আমার পুরনো ভিটা ও বাঁশবনের কথা, মায়ের কড়াখানার কথা ভাবছিলুম—কি অদ্ভুত প্রেরণাই দিয়েচে এরা জীবনে—সত্যি!···নীরদবাবুও গাড়িতে বললেন, কড়াখানার দৃশ্য তাঁকে সেদিন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ও অনুভূতি এনে দিয়েছিল মনে—গত রবিবারে সেদিন যখন ওঁরা ওখানে

গিয়েছিলেন। তারপর এলুম রবিবাসরে, ওখানে তখন প্রবন্ধ পাঠ শেষ হয়ে গিয়েচে—তরমুজের আইস্-ক্রিম ও খাবার খুব খাওয়া গেল। অতুলবাবুর কাছে একটা Spiritual Circle-এর ঠিকানা নিলুম। নীরদ আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত এল—অশোকবাবু ও সজনীবাবুদের সম্বন্ধে নানা সময়ে নানা কথা। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি যাচ্চেন সুবোধবাবুর পিতৃ-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে। বাড়ি চলে এলুম।

আজ ভাবচি, গ্রাম সম্বন্ধে একটা সত্যকার ভালবাসা ও টান ছিল শৈশব থেকে আমার মনে। কি চোখেই দেখেছিলুম বারাকপুরটাকে—যখন প্রথম মামার বাড়ি থেকে অনেককাল পরে দেশে ফিরি, পিসিমা ওই দিকের বাঁশবাগান দিয়ে আসেন। কাল তাই যখন শাঁখারীটোলার দখল-করা বাড়িটার সামনে পুরনো জমিদারী কাগজের মধ্যে ১৩১০ সালের একখানা পুরনো চিঠি কুড়িয়ে পেলাম, তখনি মনে হল,—আচ্ছা এমনি দিনে দশ বৎসরের ক্ষুদ্র বালক আমি কি করছিলাম! মনে একটা thrill হল, একটু নেশা-মত যেন!··· কোনো সত্যিকারের জিনিস মিথ্যে হয় না—সেই বেচু চাটয্যের স্ট্রীটের মধ্যে দিয়ে আজ দুপুরে নীরদবাবুর গাড়ি করে গেলাম, যে বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটের বাড়িতে একদিন কত কষ্টে কালযাপন করেচি! ···ওখানেই কষ্ট পেয়েচি, ওখানেই ভগবান সুখ দিলেন। সত্যিকার অনুভূতি অমর, তা বৃথা যায় না—আমার শৈশব-মনের সে জীবন্ত, প্রাণবান্ ভালবাসা, গ্রামের প্রতিটি বাঁশের-খোলা ও গাবগাছটিকে অতি নিকটে আপনার জন বলে ভাববার অনুভূতি ছিল সত্যিকার জিনিস—তাই আজ বহু সমঝদার মনে, সে অনুভূতিটুকু সঞ্চার করতে কৃতকার্য্য হয়েচি। সাহিত্য-সৃষ্টি মেকা জিনিস নয়, তার পিছনে যখন সত্যকার প্রেরণা না থাকে, একটা বড় অনুভূতি বা দৃষ্টি বা ভালবাসা না থাকে—সেটা কখনোই বড় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না—খুব কলাকৌশল হয়তো দেখানো চলতে পারে, খুব cleverness-এর পাঁয়তারা ভাজা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু তা সত্যিকার বড় জিনিস

হয়ে উঠতে পারে না কোনো কালেও।

চারিধারে মেঘান্ধকার আকাশের কি শোভাটা আজ রাত্রে।··· ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্চে—আমার বহু বাল্যদিনের অনুভূতি মনে আসচে—**I am re-living my childhood days**—কোন্ দিনটার কথা মনে আসচে আজ?···যেদিন বাবার সঙ্গে তম্‌রেজ ও আমি দক্ষিণ মাঠ দেখলাম—কত কুশবন, খোলা মাঠ, আকন্দ গাছ, সেই একদিন আর যেদিন আতরালি কালীদের গরুর লেজ কেটে দিয়েছিল, চণ্ডীমণ্ডপে তার বিচার হল—এই দুই দিন।

আজ দুপুরে হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা এসেছিল। একখানা বই দিলাম, নিয়ে গেল।

এইমাত্র ভয়ানক দু'ঘণ্টাব্যাপী ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল—এ বছরে এই প্রথম বৃষ্টি—সামনের রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেচে—একটা পাগল কি চীৎকার করে বলতে বলতে যাচ্ছে।

এখনও একটু একটু বৃষ্টি হচ্চে—আর জোর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মোটরগুলো জল ভেঙে যাচ্ছে—কি শব্দটা! রবিবাসরে যে বেলফুলের মালাটা দিয়েচে—তার সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। রাত এগারটা।

আজ রাত্রে ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে না—একটা উত্তেজনা, একটা অপূর্ব্ব অনুভূতির আনন্দ। অনেকদিন পরে মনে পড়ে একটা কথা। বাবা আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কৈ, খোকা—? অথচ তিনি জানেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেন নি। জীবনে সেই প্রথম শোক। সে কি অপূর্ব্ব অনুভূতির দিনগুলো—তার কি তুলনা আছে? হাজার বছর বাঁচলেও কি সে সব দিনের কথা ভুলবো কখনও!···

এই দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে মাঝে-মাঝে কথাটা মনে পড়েই কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েচি!

বাইরের অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। কি অদ্ভুত যে মনে হচ্চিল! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, কোন্ মহাশক্তির

বিরাট কন্দুকক্রীড়া যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার প্রাণীদলের উত্থান-পতনে যুগ-যুগান্তর ধরে প্রাণীদল তাদের অতি সত্যকার হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখ ধরে, কোথায় ভেসে চলে গিয়েচে—ওপরে সব সময় লক্ষ বৎসর ধরে এই মহাশক্তিটি তার বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, জানা অজানা কত শক্তি নিয়ে কোন্ কাজ করেছেন তা বুঝতেও পারচি নে আমরা। মোটে তো পঁয়ত্রিশ বছর এই ব্যাপার দেখচি—তাও না জ্ঞান হয়েচে আজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। লক্ষ বৎসরের তুলনায় সাতাশ বৎসর কতটুকু? সত্যিই এমন সব জীব আছেন, যাঁদের তুলনায় এই পঁয়ত্রিশ বছরের আমি—আমার সৃষ্ট বালক অপুর মতই অবোধ, অসহায়, কৃপা ও করুণার পাত্র—নিতান্ত শিশু! কি জানি, কি বুঝি?…কত আবোল তাবোল ভাবি, কোনোটাই হয়তো সত্যি নয় তার।

সত্যি কি অপূর্ব্ব বৈকাল!…আজ অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি। এই দশ-বারো দিন বৃষ্টির জন্যে আর একেবারে মেঘ-নির্ম্মুক্ত, অদ্ভুত বৈকালটি। কাল খিনুর বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে পদ্ম-ফোটা লওদার বিলের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরি—ফিরতে দেরি হয়ে গেল। আজ তাই দুপুরে খুব ঘুমিয়েচি। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। সত্যি, এ অপূর্ব্ব দেশ এ ধরনের অনুভূতি, গহন-গভীর, উদাস, বিষাদমাখা, আমি কোথাও কখনো দেখেচি মনে হয় না—এ সত্যিই **Land of Lotus-Eaters.** এত ছায়া, এত পাখীর গান, এত ডাঁসা খেঁজুরের সুগন্ধ, এত অতীত স্মৃতি—বেদনা-মধুর ও করুণ, আর কোথায় পেয়েচি কবে?…শরীর অবশ হয়ে যায়, মন অবশ হয়ে যায় অনুভূতির গভীরতায়, প্রাচুর্য্যে।

এইমাত্র আমাদের ভিটাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—এক টুকরো রেশমী সবুজ চুড়ির টুকরো চোখে পড়ল—কার? হয়তো মনির। মনে হল মায়ের স্মৃতি ভিটার সঙ্গে যেন মাথা। মা এই বৈকালে ঘাট থেকে গা ধুয়ে ফর্সা কাপড় পরে এসে আমাদের খাবার দিচ্চেন—এই ছবিই বার বার মনে আসে। আজ সব জঙ্গল, নিবিড় বনভূমি হয়ে

পড়ে আছে! মায়ের সেই সজনে গাছটা আছে, সেই কড়াটা—আশ্চর্য্য, পাঁচিলের সেই কুলুঙ্গি দুটো চমৎকার আছে, এখনও নতুন।

ভেবেছিলাম এখনি কুঠির মাঠে যাবো। গিয়ে কি করবো? অনুভূতি কি এখানেই কিছু কম যে, আবার সেখানে যাবো? একদিনে কত সঞ্চয় করি, মনে স্থান দিই কোথায়!···

বকুলগাছ পাখী ডাকচে—'বৌ-কথা-ক', 'বৌ-কথা-ক',—অমূল্য জামগাছে উঠে জাম পাড়ছিল—বুড়ি পিসিমা বললে, সে চারটি জাম দিয়ে গেল, তাই এখন খাবো। আজ আবার গোপালনগরের দলের যাত্রা হবে, এখন স্নান করে এসে যাত্রা শুনতে যাবো।

বেলা খুব পড়ে গিয়েছে—ছায়া ধূসর হয়ে এসেচে। এমন বিকাল কোথাও দেখি নি। আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি—মেঘশূন্য সুনীল আকাশে খুব জ্যোৎস্না উঠবে।

আদাড়ি বিল্‌বিলে থেকে জল নিয়ে বাড়ি ফিরচে হরিকাকাদের বাড়ির ওদিকের সুঁড়ি পথটায়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে বাল্যে কিসের শব্দটা বেরুতো, সেই শব্দটা বেরুচ্চে। মায়ের কথাই আবার মনে হয়।

অনেক রাত্রে বায়োস্কোপ দেখে ফিরলাম—ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, মেঘান্ধকার আকাশ, রাস্তায় জল জমে গিয়েচে—তার মধ্যে বাসখানা কেমন চলে এল! যেন এরোপ্লেনে উড়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্ছি।

বাইরের বারান্দাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—একটা **Vision** দেখলাম—এক দেবতা যেন এইরকম অন্ধকার আকাশপথে, তুষারবর্ষী-হিমশূন্যে এক হাজার আলোক-বর্ষে চলেচেন অনবরত—দূর থেকে সুদূরে তাঁর গতি। কোথায় যাবেন স্থিরতা নেই—চলেচেন, চলেচেন, অনবরত চলেচেন, হাজার বছর কেটে গেল। বিরাম বিশ্রাম নাই—**Greatness of space, Undaunted travels of** গ্রহদেব।

সেদিন পাঁচুগোপালের সঙ্গে ভগবতীপ্রসন্ন সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম। ছেলেবেলাকার সে স্থানটি হয়তো আর কখনও দেখতুম না —কিন্তু আবার সেই 'পরশুরামের মাতৃহত্যা' যাত্রাটি হয়েছিল, সেটি আবার দেখলাম—যে ঘরে বসে বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম—ভগবতীবাবু যে রোগীকে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছিলেন কতকাল আগে আমার নয় বছরের শৈশবে —লেখো 'রত্নগর্ভ' বলে, সেই কথাটি মনে পড়ল এতকাল পরে।

সত্যিই জীবনটা অপূর্ব্ব শিল্প—কি বলে প্রকাশ করি এর গভীর অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্য, এর নবীনত্ব, এর চারু কমনীয়তা—আবার সেই পথটি দিয়ে ফিরে এলাম, যে পথে বাবার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতুম।··· বিজয়রত্ন সেনের সেই বাড়িটা আজ আটাশ বছর পরে আবার দেখলাম।

আজ সকালে উঠে স্নান সেরে রামরাজাতলা গিয়েছিলুম ননীর সঙ্গে দেখা করতে। স্থানটা আমার ভাল লাগে নি আদৌ। পল্লীর শ্রী-সৌন্দর্য্য নেই, অথচ শহরের মহনীয়তাও নেই—শহরের মধ্যে দীনতা নেই, কুশ্রীতা কম, যেদিকে চাই, বড় বড় সৌধ, বিশাল আকাশ—আর ওখানে পল্লীর অপূর্ব্ব বনসন্নিবেশ নেই, Space নেই —আছে খোলা ড্রেন, দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটির তেলের আলো আর ওলকচুর বর্ষা প্রবৃদ্ধ ঘেঁষা-ঘেঁষি। ননীর সঙ্গে অনেক কথা হল। ছেলেটির মধ্যে সত্যই কিছু ছিল, কিন্তু গেঁয়ো হয়ে খুলতে পারছে না। ওকে কলকাতায় এনে ভাল সমাজে পরিচিত করে দেব।

বিকেলে বাসায় ফিরলাম। কি সুন্দর আকাশ! বৃষ্টি নেই অনেকদিন, অথচ মেঘের পাহাড় নানা স্থানে আকাশে। কেমন যে মনে হচ্ছিল, তা কি করে বলি।···বেলা পাঁচটাতে রবিবাসর ছিল প্রবাসী আপিসে। হেমেনের গানের কথা ছিল, প্রথমে অনেকক্ষণ সে এল না। আমি, সজনী, অজিত সকলেই ব্যগ্রভাবে তার প্রতীক্ষায় ছিলাম। রবিবাসরে যাবার পথে রাধাকান্তদের মাস্টার সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা।

সুশীলবাবু বিভূতির কথা উল্লেখ করে অনেক দুঃখ করলেন। সত্যিই ছেলেটি খারাপ হয়ে যাচ্চে সবাই বলে। অক্ষয়বাবুর নাকি মধ্যে একদিন ফিট হয়েছিল গাড়িতে—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। ওদের সম্পত্তিটা অভিশপ্ত—সংযম ও উদারতার অভাবে এবং কতকটা কুশিক্ষা ও দাম্ভিকতার ফলেও ওদের সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

এই সব ভাবচি এমন সময় হেমেন এল, গান আরম্ভ হল। শৈলজা বলছিল তাকে কে কে **blackmail** করেচে। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দলাদলি সত্যিই দুঃখের বিষয়। নীহারবাবু বললে, ওর কে একজন দাদা 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বলেচেন, অমন বই আর হবে না। সজনী 'অপরাজিত' নিতে চাইলে। খুব খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা হল। হেমেন সত্যিই বললে বাঙ্গালীর নিষ্ঠা ও সাধনার অভাব—সস্তা হাত-তালি ও নাম কিনবার প্রলোভনে আমরা যেতে বসেচি।

হেমেন ও আমি নানা পুরনো কথা বলতে বলতে শেয়ালদহ পর্য্যন্ত এলাম—ওকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে বললুম, পুজোর ছুটিতে লক্ষ্ণৌতে আবার দেখা হবে।

সত্যিই বড় ভালবাসি হেমেকে।

চাঁদ ওঠে নি, কিন্তু আকাশে খুব মেঘ নেই। খুব হাওয়া।

রাত দশটা—বাসার বারান্দায় বসে লিখচি। দূরের সেই মাকাল-লতা দোলানো ভিটের কথা মনে পড়চে—বর্ষাকালে খুব জঙ্গল বেড়েচে। আজ বৈকালটি কি অপূর্ব্ব হয়েছিল সেখানে· কেবল সেই কথা ভাবি। সেখান থেকে প্রথম জীবন শুরু করেছিলাম—কত পথ চলেচি, কত আলাপী বন্ধুর হাত ধরে—কিন্তু সে জঙ্গলে-ভরা ভিটেটা ভুলেচি!···

ননীকে একদিন সত্যিকার বাংলার রূপ দেখাব।

তারপর সারা রাত আর ঘুম হল না। এত অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাও কলকাতায় আর কখনো দেখি নি যেন—বর্ষাধৌত নির্ম্মল আকাশে সে কি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার খেলা! সারারাতের মধ্যে আমি একবারও ঘুমুতে পারলাম না—গুন্‌গুন্ করে গাইছিলাম—

"প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে"

—কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা এল—সারারাতের মধ্যে চোখ বুজল না মোটে।

সেদিন নীরদবাবু ও সুশীলবাবুর সঙ্গে মোটরে বহুকাল পরে যশোর গিয়েছিলাম—আবার স্কুলটা দেখলাম, আবার চাঁচড়া দেখলাম। শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যার মন্দির দেখতে দেখতে কি অদ্ভুত ভাব যে মনে জাগছিল—চারিধারের ঘন সবুজ বেত ঝোপ, পুরনো মজা দীঘি—মহলের পর মহল নির্জ্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথরপুরীর মত দেখাচ্ছিল। পেছনের ঘাট-বাঁধানো প্রকাণ্ড দীঘিটাই বা কি অদ্ভুত!···রাজা রাম-চন্দ্র খাঁয়ের চাল ধোয়া পুকুরই বা দেখলাম কতকাল পরে! একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেচে। এই ভাঙা পুরী, বনেদী ঘরের দারিদ্র, জীবনের দুঃখ-কষ্ট—Back ground—এ সব সময়ই পুরাতন দিনের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্য—tradition—এই সব নিয়ে;

সাধনার কথা বলছিলাম কাল কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে। সাধনা চাই। আমি টুইশানি ছেড়ে দেব। অপরাজিত তো শেষ হয়েচে—এইবার ছাপা আরম্ভ হবে—কিন্তু এই সময় সাধনা চাই।

(১) ভাল ভাল উপন্যাসকার ও ছোটগল্প-লেখকদের পুস্তক পাঠ।
(২) ইতিহাস, Biology ও Astronomy সম্বন্ধে আরও বই পড়া।
(৩) Philosophy সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাবিদদের বই পড়া।
(৪) Sir Thomas Browne ও Anatole France-এর বই আরও ভালো করে পড়া।
(৫) চিন্তা, ভ্রমণ, গল্প ও আড্ডা—ভাল সম্প্রদায়ে।
(৬) পল্লীতে যাওয়া ও quaint ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ।

সাধনা ভিন্ন উচ্চে **Outlook** কি করে **develop** করে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে—আরও চাই—আরও অনেক চাই।

১৯২২ সালের, কি ১৯৩২ সালের আমি, আর বর্ত্তমান আমি কি এক? অনেক বেড়েচি—যেটা বেশ বুঝতে পারি—এই দুঃখ, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে-পড়ানোর মধ্যে দিয়েও বেড়ে উঠেচি। মানুষ কখন কি ভাবে কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে—তা কেউ জানে না।

ক'টা দিন বেশ কাটল্। সেদিন হাওড়ার রায় সাহেব সুরেশ সেনের ওখানে একটা পার্টি ছিল। সুশীলবাবু আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন—রমেশবাবু, নীরদবাবু সবাই সেখানে। তারপর জ্যোৎস্না-রাত্রে গঙ্গার উপর দিয়ে ফেরা গেল। শনিবারে সকালে সকালে কাজ মিটতো, সাহেব এক গোলমাল পাকিয়ে দিলে—বললে তোমার নাম সিনেট থেকে যায় নি। সিণ্ডিকেটের সেদিনই মিটিং —ছুটির পরে ফণিবাবু ও আমি দুজনে মিলে সুনীতিবাবুর কাছে গেলাম। বাড়িতে দেখা না পেয়ে ইউনিভার্সিটি—সেখানে দেখা হল। তারপর আমরা কলেজ স্কোয়ারে অনেকক্ষণ বসে গল্প করলুম। সেখান থেকে ইন্‌স্টিট্যুউটে রাগিণী দেবীর নৃত্যকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ফণিবাবু আমাকে **Y. M. C. A**-এর সামনে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে গেল। আমি **X. Library**-তে যাবো। সেখানে সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রয়োজন। যাওয়ার সময় তাঁকে সেখানে না দেখে সোজা 'শনিবারের চিঠি' আপিসে চলে গেলাম। সেখানে নেই, আবার এলাম ফিরে, আজ নাকি হরতাল—কেউ আসে নি। ওখান থেকে বাস-এ চেপে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে ভবানীপুরে। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করেই মুরলীবাবুর বাড়ি। তারপর অনেক রাত্রে ট্রামে বাসা।

পরদিন ছুটির পরে সুনীতিবাবুর সঙ্গে **engagement.** সকালে সজনীর ওখানে গেলাম। লুচি ও চা সজনীর স্ত্রী যত্ন করে খাওয়ালেন।

সেখান থেকে দুজনে 'শনিবারের চিঠি'র আপিস—আমি খানিকক্ষণ প্রুফ দেখে স্কুলে এলাম ও ছুটির পরে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। প্রথমে এসিস্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলারের আপিসে। কেউ নেই—পরে দেখি সাহেব রেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলুম একটু পরেই সাহেব বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করা গেল। তারপর হেরম্ববাবু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব, মিঃ বটম্লি, একে একে সবাই এলেন। পাঁচটার পরে আমি ওখান থেকে ফিরে সোজা 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। গোপাল হালদারের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে সেখানে ঘোর তর্ক। সুনীতিবাবু এলেন—গল্পগুজবের পরে আমি, সুনীতিবাবু ও প্রমথবাবু তিনজনে গল্প করতে করতে বেরুনো গেল।

সুনীতিবাবু 'পথের পাঁচালী' ইংরাজীতে অনুবাদ করবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রমথবাবু ইটালিয়ানের প্রোফেসর ইউনিভা-সিটিতে, তিনি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি এলেন। আমায় বইখানা ইটালিয়ানে অনুবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা হল। ইটালিতে আমায় পাঠানো সম্বন্ধে বললেন। তিনজন ভদ্রলোক এসে দেখি বাসায় বসে আছেন—তাঁরা কালকের একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে এসেচেন।

সকালে উঠে স্কুলে গেলাম ও শনিবার সকালে ছুটির পরেই বাসায় এলাম। অনেকক্ষণ ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল। আন্দাজ চারটার সময় উঠে হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছি—শীতল পেছন থেকে ডাকলে ও একখানা পত্র দিলে। একটা সভা আছে ওদের বাড়ি—আমি সভাপতি। প্রথমে গেলাম হেঁটে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে—সেখানে Copy দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে (খুকীকে যে পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছলাম সেই পথটা ধরে) বিডন স্কোয়ার। সেখানে একটা বেঞ্চির উপর বসে কত কথা ভাবলাম! মায়ের পোঁতা সেই সজনে গাছটার কথা এত যে মনে হয় কেন? মনে হল, যে জীবনটায় আর কখনো ফিরবোনা—যা শেষ হয়ে গিয়েচে, ওই সজনে গাছটা এখনও কার ফিরবার আসায় সেই দিনগুলির মত পাতা ছাড়চে, ফুল ফোটাচ্চে

—ডাঁটা ফলাচ্চে—কে এসে ভোগ করবে? সন্ধ্যার ধূসর আকাশ—দু-চারটে তারা—'জনতার মাঝে জনগণ পতি' গানটাও আবার মনে এল—আকাশের তারাদের দিকে চাইলেই ওই অপূর্ব্ব ভাবটা হয়।

তারপর উঠে ওদের বাড়ি গেলাম। মন্মথদের বাড়ি সভা হল। আমায় করলে সেক্রেটারী। সভা ভঙ্গের পর বিভূতি গলা জড়িয়ে ধরে বললে, এখানে রাত্রে খেয়ে যাবেন। তারপরে লাল ঘরে অনেকক্ষণ আড্ডা হল। পড়বার ঘরে তারপরে বিভূতি কাছে বসে খাওয়ালে। পুরানো দিনের গল্প হল, সব চেয়ে কথা উঠল—'পুত্তলিকা', 'পুত্তলিকা' সে কথা হোল। তারপর রিক্সা করে মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-রাত্রে পুরনো দিনের মত বাসায় ফিরলাম—সেই প্রতাপ ঘোষের বাড়ির সামনে দিয়ে, থানাটার পাশ দিয়ে। একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েচি, আজ বিকালে প্রবাসী অফিসে Sir P. C. Roy-এর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম।

রবিবারে প্রসাদ এল। বেশ মাথায় বড় হয়েচে—সেই ছোট্ট প্রসাদ আর নেই। তাকে দেখে এমন স্নেহ একটা হল। আমার নাম উঠলেই এখনও সকলে কাঁদে—চাঁপাপুকুরের বড় মাসিমা কাঁদেন, এই সব কথাও বলেন। একটা চাকরির কথা বললে। তারপর আমার নাম এখন প্রায়ই সকলে করেন, সে কথাও বললে। তারপর সে চলে গেল।

আমি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি, নীরদবাবু এসে ডাকচেন। দুজনে দমদমে গেলাম—সুশীলবাবু শান্তিকে পড়াচ্ছিলেন—দুজনেই বাইরে এলেন। গল্পগুজব হল—মাঠে বসে চা খাওয়া গেল। আমরা পাঁচটার সময়ে বেরিয়ে শরদিন্দুবাবু ও করুণাবাবুর পার্টিতে এলাম। নরেন দেব, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্যাল, রমেশ বসু—সবাই এল। খুব খাওয়া-দাওয়া হল। প্রচুর খাওয়া! নরেন দেব সন্দেশ খেতে খেতে মুখ লাল করে ফেলে অবশেষে যখন আরও খেতে অনুরুদ্ধ হলেন—মরীয়া হয়ে বললেন, সন্দেশটা ভালো নয়। আমরা বেরিয়ে শেয়ালদহ স্টেশনে এসে সুশীলবাবুকে তুলে নিয়ে নীরদবাবুর গাড়ীতে নিউ মার্কেটে

গেলাম। কথা রইল বৃহস্পতিবারে 'অপরাজিত' পড়া হবে দমদমার বাগান-বাড়িতে। **Wide World** কিনে রাতে বাসায় ফিরলাম।

কিন্তু আজই মনটা কেমন উড়ু-উড়ু, মায়ের সেই সজনে গাছটা,—ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ির কথা আজ সারাটা দিন মনে হয়েছে—বিশেষ করে এই জ্যোৎস্না রাত্রে।

এবার সরস্বতী পূজা একটু দেরিতে। কিন্তু ছুটি পাওয়া গেল বেশী। সপ্তাহব্যাপী ছুটি। 'অপরাজিত' প্রায় শেষ হয়ে আসচে—ভাবলাম একবার কেওটা যাবো এসময়ে। নীরদবাবুও রাজী। গত মঙ্গলবার আমি ও নীরদবাবু মোটরে গেলাম দমদম। সুশীলবাবু যেতে পারবেন না, অতএব আমরা সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে দক্ষিণেশ্বর যাবো বলে বেরিয়ে পড়ি। সুশীলবাবুর স্ত্রীও 'অপরাজিত' শুনবেন বলে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সবাই বেরিয়ে পড়া গেল কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হল না। যশোর রোডের ওপরে একটা নিভৃত বাঁশবনের ছায়ায় বিছনা পেতে বসে আমরা 'অপরাজিত' পড়লাম—তারপর ফিরে এসে চা খেয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। রাত্রে রমেশবাবুর ওখানে নেমন্তন্ন ছিল—সেখানে প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে দেখা।

বুধবার দিনটি কাজ করলাম। বৃহস্পতিবার সকালে বনগ্রামের ট্রেনে চাপলাম—বন্ধুদের বাসায় পৌঁছে দেখি তরু নেই। হেডপণ্ডিতকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে অঞ্জলি দিলাম। দেবেনের বাসায় গেলাম, তার পর ফিরে এসে তরুর সঙ্গে গল্পগুজব করে চাল্‌কী রওনা।

কি অদ্ভুত আমের বউলের সৌরভ, কি শিমুলফুলের শোভা! বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ। কাল পয়লা ফাল্গুন, এমন বসন্তশোভা আমাদের দেশে অনেককাল দেখি নি। চাল্‌কী পৌঁছে খাবার খেয়ে খুকী, ভোঁদা সবসুদ্ধ উত্তরমাঠে বেড়াতে গেলাম—রস খাওয়া গেল—অনেকটা বেড়ালাম। তারপর ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার গেলাম মাঠে তখন চারিধার নির্জ্জন।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুরে গেলাম। সারাপথে কেমন দক্ষিণা হাওয়া—কি অপূর্ব্ব আমের বউলের গন্ধ! খুকীও সঙ্গে গেল।

সকাল সকাল ফিরে স্নান করলাম। তারপর বৈকালে বেরুতে যাবো, বৃষ্টি এল—একটু বসলাম। আবার যাবো—রামপদ এল। তাকে একটু জল খাইয়ে ছুজনে এক সঙ্গে বার হওয়া গেল। কি অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যে দিয়ে এসে পৌছলাম। আমি পটপটিতলার ঘাটের এপারে এসে দাঁড়ালাম—ওপারের রাঙা-রোদভরা মাঠের দৃশ্যটা কি যে অপরূপ! তারপর মাঠের পথ বেয়ে আমাদের বাড়ির পিছনের পথে আসচি, বেলা পড়ে এসেচে—কি বাঁশের শুকনো খোসা ও ঝরা বাঁশপাতার সুঘ্রাণ!...কতকাল আগের শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয় যে।

রামপদর কাছে বসে একটু তামাক খেয়ে ও গল্পগুজব করে শ্যামাচরণদাদার বাড়ি এলাম। সেখানে অপেক্ষা করলাম। জ্যোৎস্না উঠলে চাল্‌কী চলে এলাম। ছেলেপিলেরা এল গল্প শুনবে বলে। বঙ্কু অনেকক্ষণ ছিল।

আজ সকালে উঠে চলে এলুম।

কাল বিকালে সুশীলবাবুদের বাড়ি গেলাম। কি সুন্দর বসন্ত এবার এখানে! বৃষ্টি নেই। দেশে গিয়েছিলাম—সর্ব্বত্র আমের বাউলের গন্ধ। আজ সকালে সজনীর বাড়ি গেলাম—স্নান সেরে। বেজায় কুয়াসা! সজনীর স্ত্রী চা ও লুচি খাওয়ালেন। বড় ভালো মেয়েটি।

'অপরাজিত'র শেষ লেখাটা আজ প্রেসে দিয়ে এসেচি। কিছু করবার নেই। হাত ও মন একেবারে খালি। স্কুল থেকে ফিরে নিউ মার্কেটে গিয়ে **'Wide World'** খুঁজে পেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রীটে এসে কাপড় কিনে এই ফিরচি।

'অপরাজিত'র শেষটা ভাল করে লেখবার জন্যে তিনদিন ছুটি নিয়েছিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—ছুটি ভাল লাগে না। স্কুলটাই ভাল লাগে। বেশ ছেলেপুলে নিয়ে থাকা—অমিয়, দেবব্রত, বিমলেন্দু, সত্যব্রত এদের সঙ্গ বেশ লাগে। ওরা সবাই শিশু—নীচু ক্লাসের ছেলে। আমাকে মাস্টার বলে ভয় তত করে না যতটা

আপনার লোকের মত ভালবাসে। সব বিষয়ে সাহায্য চায়, **troubles** খুলে বলে, বেশ লাগে। ওদের নিয়ে সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, টেরই পাই না। নিষ্ক্রিয়, **Death in-life** ধরণের **existence**-এর চেয়ে এরকম স্কুল-মাস্টারীও শতগুণে শ্রেয়!

আজ একটা স্মরণীয় দিন। আজ সকালে উঠে সজনী দাসের বাড়িতে চলে গেলাম, না খেয়েই—সে এ কয়দিনই অবশ্য যাচ্ছি। কিন্তু আজ গেলাম 'অপরাজিত'র শেষ ফর্ম্মার প্রুফ দেখবার জন্যে। ওখান থেকে স্কুলে। সেখানে দেবব্রতর পরীক্ষা নিলাম। তারপর ইউনিভার্সিটির সামনে সুধীরদার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হল—সমীর বললে ভালো লিখেচে। শৈলেনবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। তারপর এক কাপ চা খেয়ে আবার গেলাম সজনী দাসের ওখানে। প্রমথবাবু ও সজনী বসে। শেষ ফর্ম্মাটা প্রেসে ছাপতে দিয়েচি। তারপরে কি করে 'পথের পাঁচালী' প্রথম মাথায় এল, সে গল্প করলাম।

আজ তাই মনে হচ্ছে, সত্যিই স্মরণীয় দিনটা। ১৯২৪ সালের পূজার সময়টা থেকে এ পর্য্যন্ত প্রায় সব সময়ই এই বই-এর কথাই ভেবেচি। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩২-এর ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এমন একটা দিনও যায়নি, যখন আমি এ বইখানির কথা না ভেবেচি—বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মনোভাব নোট করেচি, মনে রেখেচি—কত কি করেচি! ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরে বড় বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধ-ভরা ফাল্গুন-দুপুর, কত চৈত্র-বৈশাখের নিমফুলের গন্ধ-মেশানো অলস অপরাহ্ণ, বড়বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি—অপু, দুর্গা, পটু, সর্ব্বজয়া, হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েচি। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দুখানির খুব যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার

জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এ বিষয়ে ভুল নেই—কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা-ভাসা ধরণের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। সর্ব্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্ব্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।

আজ রাত অনেক হল। এদের স্কুলের উদ্দেশে বইখানি উৎসৃষ্ট করলাম। যদি সাহিত্যের বাজারে আন্তরিকতার কোনো মূল্য থাকে, তবে আমার ইসমাইলপুরে, ভাগলপুরে বড়বাসার ছাদে আমার বহু বিনিদ্র রজনীযাপনের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, বই দুখানি লিখতে আন্তরিকতার অভাব আমার ছিল না বা চিন্তার আলস্য আমি দেখাই নি।

আজ সত্যিই কষ্ট হচ্চে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল। আজ ওবেলাও প্রুফ দেখেচি, অদলবদল করেচি—কিন্তু এবেলা থেকে তাদের সকলকেই সত্যসত্যই বিদায় দিলাম। আজ রাত্রে যে কতখানি নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করচি, তার সন্ধান তিনিই জানেন, যিনি কখনো এমনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে গুটিকতক চরিত্র সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভেবেচেন—তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুরুদুরু বক্ষে চিন্তা করেচেন।

অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি। তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করচি—তবে সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যে বেশী কষ্ট হচ্চে বিদায় দিতে কাজলকে, লীলাকে, দুর্গাকে, রাণুদিকে—এরা সত্যসত্যই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। কোনোদিকে এদের কোনো ভিত্তি নেই এক আমার কল্পনা ছাড়া।

যদি দু' পাঁচজনেরও এতটুকু ভাল লাগে বই দুখানা—তবে আমার পাঁচ বৎসরের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করবো।

সত্যিই মনে পড়ে ইসমাইলপুর থেকে সাবোরে আসচি ঘোড়ায়

ভাবতে ভাবতে—নোট করতে করতে। কাত্তিক আগুন জ্বাললে সাবোর স্টেশনে। সে জিনিস আজ শেষ হল! যখন 'পথের পাঁচালী' ছাপা হয়েছিল, তখনও 'অপরাজিত' ছিল—বেশীটাই বাকী ছিল—কিন্তু আজ আর কিছু নেই।

রাত্রির অন্ধকার। চাঁদ ডুবে গিয়েচে। শহরের গোলমাল থেমেচে। আমি লিখতে লিখতে বহু দূরের অন্ধকার আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে দেখচি—জীবনদেবতার কি ইঙ্গিত, যেন আগুনের আখরে আকাশের অন্ধকার পটে লেখা।

বিদায়, বন্ধুদল—বিদায়।

আজ সকালে মহিমবাবু এসে অনেকক্ষণ বসেছিল। তারপর স্কুল থেকে গেলাম ইউনিভার্সিটিতে **Examinars' meeting**-এ। বেরিয়ে আমি ও সুনীতিবাবু দুজনে গেলাম লিবার্টি অফিসে। টমসন সাহেব সেদিন এলবার্ট হলের বক্তৃতায় 'পথের পাচালী'র উল্লেখ করেছেন—নীহার রায়ের মুখে শুনে একখানা কাগজ আনিয়ে নিলাম। তারপর বাসে উঠে সজনীর বাড়ী। সেখান থেকে ফিরে **Sample** কাগজখানা দেখা এইমাত্র শেষ করলাম। স্কুলে দেবব্রত খাতা দেখাতে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ওবেলা—তাকে বললাম, তুই আমার ছেলে তো?

সে বললে একটু সলজ্জ হেসে—হ্যাঁ। ও কখনো একথা বলে নি এর আগে। তাই আজ আনন্দে মনটা পূর্ণ আছে সারাদিন।

আজ রাত্রে 'অপরাজিত' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডটা সজনীর কাছ থেকে আনলাম। আজ সকালেই বই বার হয়েছে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থেকে চা খেয়ে ও গল্প-গুজব করে চলে এলাম।

দ্বিজরাজ জানা মারা গিয়েচে বলে সকালে ছুটি হল। বেরিয়ে আমি যতীনবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ও নিউ

মার্কেটে বেড়ালাম। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি গেলাম কাগজের খোঁজে। কাগজ পেলাম না। বীরেনবাবুও ছিল। বেরিয়ে বাসায় এসে একটু ঘুমনো গেল।

এখন রাত। সিঁদুরে মেঘ হয়েচে। মনটা কেমন একটা বিষাদে পরিপূর্ণ—মনটা শূন্য হয়ে গিয়েচে—অপু, দুর্গা, সর্ব্বজয়া, কাজল; লীলা, পটু, বিনি—এরা সব আজ মনের বাইরে চলে গিয়েচে, কতকালের সহচর-সহচরী সব—সেই ইসমাইলপুরে এমন সব চৈত্র অপরাহ্নে Wide World-পড়া দিনগুলো থেকে ওরা আমার মনের মধ্যে ছিল—কাল একেবারে চলে গিয়েচে।

ওদের বিরহ অতি দুঃসহ হয়ে উঠেচে।

এর আগে ক'দিন মনটা ছিল নিরানন্দ। কেবল গৌরীপুরের মাঠে যেদিন Picnic করতে যাই আমরা—সেদিনটাতে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই আধ-জ্যোৎস্না আধ-আঁধার রাত্রে তালবনের ধারে পুকুরপাড়ে বসে কত কি গল্প—কতকাল ওসব কথা মনে থাকবে।

কাল রাত্রে সাহিত্য-সেবক-সমিতিতে সভাপতি ছিলাম। অচিন্ত্য একটা গল্প পড়লে—গল্পটা মন্দ হয় নি—সেখান থেকে বেরিয়ে অনাথ ভাণ্ডারের থিয়েটার দেখতে যাবো কথা ছিল, কিন্তু অবনীবাবু, সুকুমার ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে জমে গিয়ে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত হৃষিকেশ লাহাদের বাড়ির সামনের পার্কটাতে আড্ডা দিলাম। সেখান থেকে বা'র হয়ে বাসায় ফিরলাম অনেক রাতে।

আজ বেলা চারটার ট্রেনে শ্রীরামপুর গেলাম। সেখানে 'আনন্দ পরিষদের' অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে হবে। ছেলেরা ওখান থেকে এসেছিল। অবনীবাবুকে সঙ্গে নেব বলে ডাকতে গেলাম, পেলাম না। ঝন-ঝন করচে দুপুরের রোদ। কিন্তু একটু পরে বেশ মেঘ করে এল। শ্রীরামপুরে শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে গেল। লীলারানী দেবী লেখিকা, 'কল্লোল' ও 'উপাসনা'য় লেখেন। ওপরের বারান্দাতে তিনি বরফ দিয়ে শরবত তৈরী করে খাওয়ালেন

ও জলখাবার দিলেন। তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এঁদের বাড়ির কাছেই খুকীর শ্বশুরবাড়ি। একবার সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ছিল। লোকও পাঠালাম—কিন্তু লোক ফিরে এসে বললে কারুর সঙ্গে দেখা হল না।

সভায় যখন আসচি—ওদের বাড়িটা দেখলাম—ভাঙা দোতলা বাড়ি—একটা কয়লার গোলার পাশ দিয়ে পথ। সভার কার্য্য শেষে আবার ভূরিভোজনের ব্যবস্থা। সমবেত ভদ্রলোকেরা আমাকে একটা বড়লোকের দোতলার হলে নিয়ে গেলেন—সেখানেই একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে নানারকম ফলমূল, মিষ্টান্ন, শরবৎ সাজানো। এত খাই কি করে? এই শ্রীলীলারানী দেবীর ওখান থেকে খেয়ে আসচি। কে সে কথা শোনে? আনাতোল ফ্রাঁসের **Procurator of Judea** গল্পটি খেতে খেতে ওঁদের কাছে করলুম—রসের বৈচিত্র্য ও **quaintness** হিসেবে।

ওরা ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। ট্রেনে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল—বাড়ি জিরেট-বলাগড়, বিড়ি খাওয়ালে, গল্প-গুজব করলে। হাওড়া স্টেশন থেকে হেঁটে বাসায় এলাম। পথে পানিতরের বামনদাস দত্তের সঙ্গে দেখা। আজ পয়লা মে। একটা স্মরণীয় দিন। আজকার সভার জন্যে বা এসব আদরের জন্যে নয়—আজ ১৩ বৎসর হতে সেই ১লা মে-তে—কিন্তু সেকথা আমিই জানি, আর কেউ জানে না। জানবার কথাও নয়; বোলবও না কাউকেও।

বেশ হাওয়া, বাসায় এসে বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে রইলাম।

আজ মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ পেলাম—অনেক কাল পরে। মনে পড়ে গেল বাল্যে দুপুরে আহার সেরে এই সব দিনে বাড়ির পেছনে বাঁশবনে মুখ ধুয়ে আসতাম। বাঁশবনে গিয়ে আঁচালে তবে মনে একটা আনন্দ আসত—কত তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু একদিন ও থেকে কি গভীর আনন্দই পেয়েছি!···সেই ভিটে, সেই গ্রাম আজও তেমনি কেবল বদলে গিয়েচি। আজ রবিবার ফণিকাকারা তাড়াতাড়ি করচে এত রাত্রে হরি রায়ের বাড়িতে তাস খেলতে যাবে বলে—আনন্দ

করচে ঝিট্‌কীপোতার বাঁওড়ে বড় রুই মাছের বাচ হচ্চে বলে—হাটে আজ মাছ সস্তা হয়েছে বলে—আমিও যদি গ্রামে থাকতুম—আমিও ও থেকে আনন্দ পেতুম ওদেরই মতন—কিন্তু আমি বদলে গিয়েছি একেবারেই। **Sophisticated** হয়ে পড়েচি, **hampered** হচ্চি দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট হয় নি বলে এখনও এসব বুঝতে পারি।

আকাশের অগণ্য তারায় তারায় কত দেবলোক, কত পৃথিবী, কত জগৎ—কত অগণিত প্রাণীকুল, কত দেবশিশু—আনন্দের কি মহান, অসীম ভাণ্ডার! দুঃখও যত বৃহৎ তাদের আনন্দও তত বৃহৎ। এই ভেবেই, চৈতন্যের এ প্রসারতা শুধু আমার আজ রাত্রে।

আজ সকালে উঠতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, কারণ কাল অনেক রাত্রে দমদম্ থেকে ফিরেচি। সেখানেই রাত্রে খেলাম, আগামী রবিবারে **Outing**-এর নক্সা করলাম, তারপর আমি আর নীরদবাবু মোটরে ফিরেছি। আজ এইমাত্র সাহেবের ওখান থেকে আসছি। সাহেব একটু দমে গিয়েচে—আসি ফণিবাবুর সঙ্গে ওটা মিটিয়ে ফেলতে বললুম।

কন্‌ভেণ্ট রোডটা অন্ধকার, এখানে-ওখানে যুই ও মালতীর সুগন্ধ. আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার, নক্ষত্রে ভরা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম সাহেবের হাঙ্গামাটা যেন মিটে যায়।

একটা কথা মনে হচ্চে। মানুষের মনের ব্যাপকতা যত বাড়বে ততই সে পূর্ণ মনুষ্যত্বকে লাভ করবে। এমন সব মানুষ জীবনে কতই দেখলাম তাদের মনের সতর্কতা, চৈতন্যের ব্যাপকতা বড়ই কম। এত কম যে আহার-বিহার ও অর্থোপার্জ্জনের বাইরে যে আর কিছু আছে তা তারা ভাবতে পারে না। জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, আর্ট বল, সাহিত্য বল—এ সবের কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। এমন কি স্নেহ, প্রেম, কল্পনা, বন্ধুত্ব, এ সবও তাদের অজ্ঞাত—**loyalty**-কে তারা ভীরুতা ভাবে, স্নেহকে দুর্ব্বলতা ভাবে। ফণিবাবু একজন এই ধরনের মানুষ। এ সব লোকের নির্বুদ্ধিতা আমি বরদাস্ত করতে পারি নে একেবারেই।

মূর্খতারও একটা সীমা আছে, এদের তাও নেই।

সে যাক। এই চৈতন্যের ব্যাপকতার কথা বলছিলাম। এই মুক্ত প্রকৃতি, সবুজ ঘাসেমোড়া ঢালু নদীতীর, কাশবন, শিমূলবন, পাখীর ডাক—নীল পর্ব্বতমালা, অকূল সমুদ্র, অজানা মহাদেশ—হাসিমুখ বালক-বালিকা, সুন্দরী তরুণী, স্নেহময়ী পত্নী, উদার বন্ধু, অসহায় দরিদ্রদল,—এই বিরাট মানবজাতির অদ্ভুত ইতিহাস, উত্থান-পতন রাজনীতির ও সমাজনীতির বিবর্ত্তন, এই বিরাট নক্ষত্রজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কা—জানা-অজানা জাগতিক শক্তি,—**X-ray**, বিদ্যুৎ, **invisible rays, high, penetrating radiation.**—ওই মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যুপারের বিরাট জীবন—এই রহস্যে স্পন্দমান, অসীম, অদ্ভুত জীবনরহস্য—এই সৌন্দর্য্য, এই বিরাটতা, এই কল্পনার মহনীয়তা,—এসবে যারা মুগ্ধ না হয়, গরু-মহিষের মত ঘাস-দানা পেলেই সন্তুষ্ট থাকে, যারা এই রহস্যময় অসীমতার সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিদ্রিত ও উদাসীন রইল—সে হতভাগাগণ শাশ্বত ভিখারী—তাদের দৈন্য কে দূর করতে পারবে ?

মানুষের মত যত উদার হবে, যত সে নিজের চৈতন্যকে বিশ্বের সবদিকে প্রসারিত করে দিতে পারবে, অণুর চেয়ে অণু, মহানের চেয়েও মহান্ বিশ্ববস্তুর প্রতি আত্মবুদ্ধিকে যত জাগ্রত করে তুলতে পারবে—সে শুধু নিজের উপকার করবে না, নিজের মধ্য দিয়ে সে শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকারজাল ও জড়তাকে প্রতিভার ও দিব্যদৃষ্টির আলোকে প্রসারিত করে দিয়ে যাবে। সেই সত্য নিত্যকালের মশাল্‌চি।

সেদিন চারু বিশ্বাসের বাড়িতে অনেক রাত পর্য্যন্ত মিটিং হল। রাত দশটার পর সেখান থেকে রওনা হয়ে আসতে গিয়ে লাউডন ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা টায়ার গেল ফেটে। মৌলালীর মোড়ে আবার মহরমের বেজায় ভিড়। অনেক কষ্টে রাত্রে বাড়ি পৌঁছলাম। ভোরে স্নান সেরে বসে আছি নীরদবাবু গাড়ী নিয়ে এলেন। চা পান করে দমদম্ থেকে বেরুনো গেল। বনগাঁর পথে এ গাড়িরও একখানা

টায়ার গেল। বনগাঁয়ে পৌঁছে বাজার করে বেলডাঙ্গা পৌঁছুতে বেলা নয়টা। বটতলায় গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে সবাই মিলে রেঁধে খেলাম। শ্যামাচরণদাদাদের বাড়ি এলাম—সেখান থেকে নৌকা করে নকু-ড়ুলের ঘাট পর্য্যন্ত বেড়ালুম—সবাইপুরের ঘাটে স্নান করলুম। তারপর সেদিন রাত্রে দমদমাতে ফিরে খেয়ে আবার এলুম বাসাতে।

এবার বাড়ি গিয়ে বড় গোলমাল। ক'দিন বেশ কেটেছিল, শ্যামাচরণদাদার স্ত্রীর স্নেহ বড় উপভোগ করেচি—বৌদি বড় ভাল মেয়ে—আমার শ্রদ্ধা হয়েচে। বর্ষাবাদলের দিনে পুঁটিদিদিদের বাড়ি গরু-বাছুরের সঙ্গে একঘরে বাস করে মনটা খিঁচড়ে উঠেছিল। ওখানে এবার তুফন্ ঠাকরুন মারা গেলেন। আসবার আগের দিন তাঁর শ্রাদ্ধ হল। রোজ বিকেলে বকুলতলায় বসতুম। জগা ছড়া বলত—

"অশন বসন রণে সদা মানি পরাজয়,
দুনয়নে বারিধারা গঙ্গা যমুনা বয়—
কথায় কথায় তুমি যেতে বল যমালয়,"—ইত্যাদি

ছেলেমানুষের মুখে বেশ লাগত।

কিছুদিন কলকাতা গিয়ে রইলাম—একদিন নীহার রায়ের ওখানে গেলাম, সেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব বসে আছে 'অপরাজিত' সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হল। নীহার বললে—'অপরাজিত' একটা **Great Book**, আমি এঁদের সেই কথাই বলছিলাম, আপনি আসবার আগে। ধূর্জ্জটিবাবুর বাড়িতে একদিন 'অপরাজিত' নিয়ে আলোচনা হল আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক অনেক জায়গা দাগ দিয়ে পড়েচেন, মার্জ্জিনে নোট লিখে। তারপর নীরদের বাড়িতে চা-পার্টি উপলক্ষ্যে সুনীতিবাবু ও রথীন্ হালদারের সঙ্গে সে সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

রবিবারে গেছলাম, আবার পরের রবিবারে ফিরি। সেদিন রাণাঘাটে নেমে কি ভয়ানক বর্ষা। গোপালনগরে নামলাম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। অতি কষ্টে গাড়ির যোগাড় করে ফিরলাম। হাট বার, সুশীলবাবু একটা মোট পাঠিয়েছিলেন শ্যামাচরণদাদদের জন্যে—সেটা তাঁদের দিলাম।

কাল খুব গুমট হয়েছিল। বৈকালে জেলি, সরলা এর পড়তে এল—বকুলতালয় চেয়ার পেতে বসে খুকুর সঙ্গে খুব গল্প করলুম। রিমঝিম বর্ষার মধ্যে মেঘভরা আকাশের তলা দিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ওপরে বর্ষাস্রোত বয়, গাছপালা, সবুজ তৃণভূমি—বৃষ্টিতে চারি-ধারে ধোঁয়া-ধোঁয়া—তারপর গেলাম ওপাড়ার ঘাটে। জল গরম—নেমে স্নান করতে করতে চারিদিকে চেয়ে সে কি আনন্দ পেলাম—মাথার উপর উড়ন্ত সজল মেঘরাশি, জলের রং কাকের চোখের মত, কি সুন্দর কদম গাছটার রূপ—মনে হল ভাগলপুরের সেই অপূর্ব্ব সবুজ কাশবনের চর—সুদূরপ্রাসরী প্রান্তরের সেই সুন্দর প্রাণ-মাতানো স্মৃতিটা—সেও এমনি বর্ষা সন্ধ্যা, এমনি মেঘেভরা আকাশ—হাতীর পিঠে চড়ে আমীনের সঙ্গে সেই বেড়ানোটা। আমি জলে সাঁতার দিলাম। মনে হল যেন আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা—এই মুহূর্ত্তে পাখা ছেড়ে এই মেঘ-ভরা আকাশ চিরে ওপারে বহু দূরে কোথায় উড়ে যাবো!

এমন আনন্দ সত্যিই অনেকদিন পাই নি।

এখনও সোঁদালিফুল আছে—কিন্তু এবার অতিরিক্ত বর্ষায় অনেক অনিষ্ট করেচে—অনেক ফুলই ঝরে পড়ে গিয়েচে! সোঁদালিফুল এত ভালবাসি যে ঘাটের নাইবার সময় ঘাটে ধারে যে গাছগুলো আছে, সেদিকের ফুলের ঝাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকি—নইলে যেন প্রাণের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। দু-এক ঝাড় যা আছে, তাদেরও চেহারা বড় শ্রীহীন। কি করি, ওদের নিয়েই যা একটু আনন্দ পাই।···

আগের দিন জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে বেলেডাঙার মাঠে গিয়েছিলাম। এ দিন বৃষ্টি ছিল না, সুন্দর মাঠ তৃণাবৃত, সোঁদালিফুল এখনও গাছে গাছে খুব। দুটি রাখাল ছেলের সঙ্গে কতক্ষণ বসে গল্প করলাম, মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়ালাম, নদীজলে সন্ধ্যায় নাইতে নেমে সাঁতার দিলাম খুব। মোড়টা ফিরতে কুঠীর পথে একটা ঝোপের মধ্যে একটা ডালে কি ফুল ফুটে আছে—বাল্যজীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়··· এক সময়ে এরাই ছিল সহচর, এদের সব চিনি।···

রোজ খেয়ে উঠে মুখ ধোবার সময় খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশতলার দিকে যাই। ঐ সময়টা বহু পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে যেন—পুরাতন বাল্য-দিনগুলি প্রতিদিন ঐ সময়টাতে ফিরে আসে।

এখনও গ্রীষ্মের ছুটি এবার শেষ হয় নি। পরশু পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু খুলবাব সময় হয়েচে! মনটা বড় খারাপ হয়ে আসচে। কত কথা যে মনে আসচে—কত গ্রীষ্মের ছুটি এ রকম করে কাটল। অথচ দেশে তো আমার কেউ নেই—যখন ছিল সে ছিল আলাদা কথা।…

এবার জ্যেষ্ঠ মাসটা বড় বর্ষা। যখন বাঁশতলী গাছে আম পেকে টুক্‌টুক্ করছে, যখন যুগল কাকাদের চারা বাগানে আম পাকচে—তখন বর্ষার আকাশ এমন ঘন মেঘাচ্ছন্ন, যেন শ্রাবণ মাস কি আষাঢ় মাস। যে সময়ে কলেজে পড়বার সময়ে আমি বেলেডাঙার পথের বটতলার শান্ত আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার নিরাশ্রয়তার মধ্যে চলে আসতুম, খুব কষ্ট হত। এবারে কিন্তু কত দিন পর্য্যন্ত আমি রইলাম! কি সুন্দর বর্ষাদৃশ্য এবার দেখলাম ইছামতীর চরে, ইছামতীর কালো জলের ওপরে! কি বড় বড় মেঘের ছায়া!…ঘাটের পথে খেজুর গাছটায় খেজুর এখনও বোধ হয় খুঁজলে দু-একটা পাওয়া যাবে।

ওদের নিয়ে রোজ পাঠশালা করতুম, খুকু Sentence লিখত, জগা ছড়া বলতো ঃ—

'এঁতল বেঁতল তামা তেঁতল
ধর তো বেঁতল ধরো না'—

কি মানে এর, ও-ই জানে—অথচ কি উৎসাহেই আবৃত্তি করত! শিবু ও সুরো ধনুক বাণ নিয়ে যাত্রা করতে আসত, খুকু কত রাত পর্য্যন্ত বসে আমার কাছে গল্প শুনত,—জ্যোৎস্না উঠে যেত তবুও সে বাড়ি যেতে চাইত না। এক-একদিন আবার দুপুরে এসে বলত, গল্প বলুন। আসবার দিন বকুলতায় বসে ওকে খাতা বেঁধে দিলাম, Sentence করতে দিয়ে বলে এলাম, এসে আবার দেখব।

"মায়ের ভাঙা কড়াখানা উল্টে পড়ে গিয়েছে, ভিটেটাতে বড় বেশী জঙ্গল হয়েচে—অপু" যেমন বইতে লিখেচি।

কুঠীর মাঠে গিয়ে এক-একদিন গামছা পেতে শুয়ে থাকতুম—খুব হাওয়া, বড় চমৎকার লাগত। কিন্তু যখন ইছামতীর জলে নাইতে নামতুম সকালে ও বিকেলে—সেই সময়ই সকলের চেয়ে লাগত ভালো। ও পাড়ার ঘাটের সামনে সবুজ ঢালু ঘাস-ভরা মাঠ ও আঁকাবাঁকা শিমূলগাছটা যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলত চোখের সম্মুখে তা কাকে বলি, কে-ই বা বুঝবে? যখন আসি তখনও বৌ-কথা ক' ছিল, তখনও পাপিয়া, কোকিল ডাকত, অথচ তখন তো আষাঢ় মাস পড়েই গিয়েছিল।

এবার এ-বাড়ি ও-বাড়ি এত নিমন্ত্রণ সবাই করে খাইয়েছে—কেন জানি না, অন্যবার এত নিমন্ত্রণ তো করে না।

দেবব্রতকে কত কাল দেখি নি—তার মুখ ভুলেই গিয়েছি—এত কাল পরে এইবার দেখব।

সেদিন বনগাঁয়ে গেছলাম—সকালে খুকীর সঙ্গে পাকা রাস্তায় সাঁকোতে কত খেলা করলুম। খুকী কত ফল তুললে, পাতা তুললে, আমিও কত ফল পেড়ে নিয়ে এসেছিলাম; খুকী রাঁধলে। খুকীর সঙ্গে ছেলেমানুষী খেলা খেলে ভারী আনন্দ পাই।* খুকী কিন্তু পড়াশুনো করে না, এই ওর দোষ। খুকু এর মত নয়, খুকু খুব বুদ্ধিমতী, পড়াশুনোর খুব ঝোঁক।

বনগাঁয়ে সেদিন বোটের পুলে বিশ্বনাথ, দেবেন, সরোজ সবাই বসে গল্প করছিল, আমি যেতে অনেকক্ষণ বসে গল্প হল, বিশ্বনাথ নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালে। রাত্রে এই দিন বন্ধুর বাসায় খাওয়ার পরে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে বেড়াতে বনগাঁ স্কুলের ফটকে ঠেস দেওয়ানো বেঞ্চিটার ওপর গিয়ে বসলাম। কত কথা মনে আসে! চব্বিশ বছর আগে একজন বারো বছরের ক্ষুদ্র বালক একা বাড়ি থেকে ভর্ত্তি হতে এসে ওই জায়গাটাতে লাজুক ভাবে চুপ করে বসে ছিল—কতকাল আগে! সেদিনে আর আজকার মধ্যে কত তফাত তাই ভাবি। হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে বেড়িয়ে এলাম—বাড়ি-

* খুকু-এবং খুকী এক নয়,—খুকু থাকে বারাকপুরে আর খুকী বনগাঁয়ে।

এর সব ঘরের সামনে বেড়ালাম কিন্তু পর পর সেদিনের কথাটা মনে আসছিল—একটি ছোট ছেলে বর্ষার জলা ও আষাঢ়-শ্রাবণের আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙে এক-গা কাদা মেখে চাদর গায়ে, মায়ের কাছ থেকে ভর্তি হওয়ার সামান্য টাকা ও দুটি পয়সা জলখাবারের জন্য বেঁধে এনে লাজুক মুখে চুপ করে ওই স্কুলের পৈঠার উপর বসে আছে —এমন মুখচোরা যে, কাউকে বলতে পারচে না ভর্ত্তি কোন্ ঘরে হয়, বা কাকে বলতে হবে ?

সেই ছোট ছেলেটি চব্বিশ বছর আগেকার আমি···কিন্তু সে এত দূরের ছবি, যে আজ যেন তার ওপর অলক্ষিতে স্নেহ আসে।

ওঃ এবার যেন ছুটিটা খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছে। সেই কবেকার কথা, সুশীলবাবুর স্ত্রী বটতলার ভাত রেঁধে আমাদের পরিবেশ করে খাইয়েছিলেন, আমরা কাঠ কুড়িয়েছিলাম, যুগল এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছিল—সে কত দিনের কথা। তারপর গোপালনগরের বারোয়ারী, তুফন্ ঠাক্‌রুণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, সে সবও কতকালের কথা! বড় চারার আম কেনা, মাঠের চারার আম কেনা, সে সবও আজকার কথা নয়। আঁচানোর সময়ে খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে গাছপালা ও বাঁশ-বনের দৃশ্যটা এত অদ্ভুত যেন একেবারে শৈশবে নিয়ে যায় এক মুহূর্ত্তে।

জীবনের রূপ ও সৌন্দর্য্যে ডুবে গেলাম। হে ভগবান্! এর তুলনা দিতে পারি নে।

পঞ্চানন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হল, ইউনিভার্সিটির একটি **brilliant** ছেলে, রেবতীবাবুর বন্ধু। পথে আসতে আসতে অবনী ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা। তারা মনোজের বাড়ি কাঁঠাল-খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেচে। বৃষ্টি আসচে দেখে আমি দৌড় দিলাম।

বাসায় এসে ঠিক করলুম এই ঘরটা আমি একলা নেব। এ বৎসরটা খুব পড়ব, লিখব, চিন্তা করব। **Prescott's Peru. Shackleton's Voyages** ও **Historiography**-র ভালো বই এবার পড়তে হবে—যদিও **Prescott** আমার পড়া আছে, তবু আর একবার পড়ব। চিন্তায় যে নির্জ্জনতা চাই, তা ঘরে একা না থাকলে হবে না।

Crystallography সম্বন্ধে কিছু পড়তে হবে।

এ কয় মাস এই খাতাখানা হারিয়ে গেছল। তাই মাস পাঁচেক ধরে এতে কিছু লেখা হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খাতাখানা ছিল আমার বাক্সটাতে, সে বাক্সটা কতবার খুঁজেচি খাতাখানার জন্যে, তবু সন্ধান পাই নি। আজ পালিতদের তারাপদবাবু এলেন সন্ধ্যার সময়ে। তাঁদের সেই ঠিকুজী-কুষ্ঠীখানা আমার কাছে অনেক দিন পড়ে আছে, তাই ফিরিয়ে নিতে এলেন। বাক্স খুলে ঠিকুজীখানা খুঁজতে খুঁজতে এ খাতাখানাও বার হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে—এই পাঁচ মাসের মধ্যে—আমার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সব দিক থেকে পরিবর্ত্তন। জানু মারা গিয়েচে, ওর সংসার পড়েচে আমার ঘাড়ে, জীবন ছিল দায়িত্বহীন, অবাধ—এখন আমি পুরোদস্তুর ছা-পোষা গেরস্ত মানুষ। বনগাঁয়ে বাসা করে ওদের সব সেখানে এনে রেখেচি। সেটা যখন আমার কর্ত্তব্য, তখন তা আমায় করতেই হবে, স্বার্থপর হতে পারব না কোনদিন।

আরও পরিবর্ত্তন হয়েচে। ক্লারিজ সাহেব চলে গিয়েচে, দেবব্রত চলে গিয়েচে। কোথায় গিয়েচে, বা দেবব্রতের কি হয়েচে তা আমি লিখব না। কিন্তু আমার মনে যে ব্যথা লেগেচে এতে—ভেবে দেখবারও অবকাশ পাই নে সব সময়। এক-একবার গভীর রাত্রে মনে পড়ে, ঘুম আসে না চুপ করে থাকি—অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি—সে ব্যথা বড় সাংঘাতিক—যাক্ ও-কথা আর লিখে কি হবে!

সেদিন শিবরাত্রি গেল। এই শিবরাত্রির সঙ্গে আমি সেদিন বসে বসে হিসেব করে দেখছিলাম যে, জীবনের কত সুখ-দুঃখের কাহিনীই না জড়িত রয়েচে। মধ্যে একদিন এসেছিল বনগাঁয়ের হরবিলাস—নৃপেন রায়ের নতুন কাগজের জন্যে, (তার নাম আমি আজই করে এসেছি ‘উদয়ন’)—তাকে বললুম—তোমাদের বাসাটা আমায় দেবে? আমি গভীর রাত্রে বসে-বসে ভাবছিলাম, তা যদি হয়, ওরা যদি বাসাটা ছেড়ে দেয়—তা হলে সেখানে কি করে বাস

করব ? কত কথাই না মনে পড়বে ! মনে পড়বে আমি যখন বালক, কিছুই বুঝি নে—বনগাঁয়ে হেডমাস্টার মশাশয়ের বেতের বিভীষিকায় দিনরাত কাঁটা হয়ে থাকি—সেই সব দিনের কথা। সেই এক শিবরাত্রি—কিন্তু না তার আগেও শিবরাত্রির কথা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত আছে। ছেলেবেলায় হালিসহর থেকে সেই যে এসেছিলাম—ছোট মামা প্রভাতী গান করত বৈষ্ণবদের সুরে—আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে নদী থেকে নেয়ে আসতুম—জীবনের সেই প্রথম শিবরাত্রি যার কথা মনে আছে। তারপর অবিশ্যি বনগাঁয়ের ঐ শিবরাত্রি। ওঁরা এসে বাইরের ঘর থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন মন্ত্র পড়াতে—বেশ মনে আছে। তাই ভেবেছিলাম এতকাল পরে—জীবনের এত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের পরে আবার হরবিলাসদের বাসায় থাকব কেমন করে ?

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাই জানি না। আট মাস বেঁচে ছিল—কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্পদিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি ? ও আপন মনে হাসত—কিন্তু সবাই বলত "আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখচে ?" ওর অপরাধ—ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল ! সত্যিই ওর হাসি কেউ চাইত না। ওর বাবা তো মারা গেল ; ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউ দেখত না—ওর খুড়িমা বললে—টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকোল-তলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠানে—আমার কষ্ট হত—কিন্তু আমি কি করব ? আমি তো আর স্তনদুগ্ধ দিতে পারি নে ? ওর রিকেট্‌স্ হল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল—তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাসায় বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাসত—সেদিনও তেমনি হাসতে দেখে এসেছি···ও-শনিবারে যখন বাড়ি থেকে আসি। **Unwanted smile** ! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি—এ ছাড়া আর কোন চিহ্ন

কোথাও রেখে যায় নি ও। **Poor little mite**। কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত,—এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটুফুলের দলে ফুটেচে, ফুলে ফুলে কত কাল ধরে ফুটে আসচে—কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবনধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নিত্য—খুকীর হাসিও তেমনি।

পার্ক সার্কাস থেকে ট্রামে আসতে আসতে তারা-ভরা নৈশ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেচে—এই ঘূর্ণামান, বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, এই সৃষ্টিমুখী নীহারিকায় প্রজ্জ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের রাশি—এই অনাদ্যন্ত মহাকাল—এরা যেমন নিত্য, যতটুকু নিত্য, যে অর্থে নিত্য, তার চেয়ে কোন অংশে কম নিত্য নয় আমার অবোধ, অসহায়, রোগশীর্ণ খুকীর দন্তহীন কচিমুখের অনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন, অকারণ হাসিটুকু। বরং আমি বলচি তা আরও বড়—এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন একটা বিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম নীতি আছে, উদীয়মান সবিতার রক্তরাগের মত তা অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে—এইজন্য অর্থযুক্ত করে যে, যে গৌরবে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রূপ পেয়েচে, মহিমময় হয়েছে—সেই বর্ণ সবিতার দান, আদিম অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা বসুন্ধরার মুখের আবরণ অপসারিত করেছেন সবিতা তাঁর আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে—তাকে সার্থক করেচেন, জাগ্রত করেচেন, মাটির মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকীর হাসি সবিতার ওই অমৃতজ্যোতির মত, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা বিশ্বের জড়পিণ্ডে প্রাণের সঞ্চার করে, বিপুল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে, গৌরবময় করে।

তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়,—তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা সম্ভব হয়েচে সৃষ্টির ওই অধ্যাত্মনীতির আইনে—ও নীতি অমোঘ-- ওর শক্তি ও ওর সত্য, অস্তিত্ব অন্তরতম অন্তরে অনুভব করতে পারি - কিন্তু ভাষায় বোঝানো যায় না।

*বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙামাটির টিলার গায়ে। চারিধার কত নিঃশব্দ—আকাশ কেমন নীল—অনেকদিন এমন মনের আনন্দ পাইনি—কলকাতার মুমূর্ষু নিস্তেজ মন কাল সারারাত ও আজ সারাদিনের মাঝে বন্য-সৌন্দর্য্য দেখে, প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশ বনের ও ধাতুপ ফুলের প্রাণবন্ত রূপ দেখে—ইব্ স্টেশনের অরণ্য-নদী-পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন বিরাট পটভূমির দৃশ্যে একমুহূর্ত্তে তাজা হয়ে উঠল—কি ঘন শাল-পলাশের বন—কি সুন্দর জনহীন প্রান্তর, দূরে দূরে নির্জ্জন পর্ব্বত-মালা—মন অভিভূত হয়ে পড়ে কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে মাথা সতেজ হয়ে ওঠে। রোদ কি অপূর্ব্ব রাঙা হয়ে এসেচে—স্টেশনের পাশের পথটা দিয়ে সোমড়ার হাট থেকে সাঁওতালী মেয়েরা হাট করে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যাচ্চে। হাটটায় এইমাত্র আমি প্রমোদবাবু ও কিরণবাবু বেড়াতে গিয়েছিলাম—বেগুন, রেড়ির বীজ্ কচি ইঁচড়, চিংড়ি, কুমড়ো, খই, মুড়ি বিক্রি করচে। এক জায়গায় একটি সাঁওতালী যুবতী ধান দিয়ে মুড়কী নিচ্চে। এই হাটের সামনে একটা প্রাকৃতিক জলাশয়ে আমরা স্নান করলুম। ভারী আনন্দ পেয়েচি আজ—ভাগলপুর ছেড়ে আসবার পরে এত আনন্দ সত্যই অনেককাল পাই নি।

রোদের রাঙা রং অতি অপূর্ব্ব!

ডাকবাংলো থেকে লোক জিজ্ঞেস করতে এসেচে আমরা রাত্রে কি খাব।

† সকালে আমরা রওনা হলাম। পথে কি সুন্দর একটা পাহাড়ী ঝরনা। সিরসির করে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেচে। কতকগুলি লোক একটা কাঠের পুলের ওপর খড় বিছিয়ে দিচ্চে। তারা বললে, পাটোয়ারীর ছেলে এ-পথে চলে গিয়েচে। পাহাড়ী করবীর দল জলের ধারে ফুটে রয়েচে। শান্ত শাল-পলাশের বনের ছায়া।

---

* সম্বলপুর

† বিক্রমখোলের পথে

এখানেই সবাই উড়িয়া বুলি বলচে। এমন ভাল লাগে!

নীল আকাশের তলে অফুরন্ত বাঁশের জঙ্গল। শাল-পলাশের বনে রোদ ক্রমে হলদে হয়ে আসচে। প্রিণ্ডোলা থেকে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে ৭।৮ মাইল পথ হেঁটে দুপুরে বিক্রমখোলে পৌঁছলাম। বিক্রমখোলের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েচে—তাই দেখবার জন্য আমরা এখানে এসেচি। লেখাটা ভারী চমৎকার জায়গায়—একটা Limestone-crag-এর নীচে ছায়াভরা জায়গায় প্রাকৃতিক ছোট একটা গুহা মত-তারই গায়ে লেখাটা। চারিধারে বন যেমন গভীর তেমনি সুন্দর—পথের মধ্যে জঙ্গলে কত ধরনের গাছ। আমলকী ও হরিতকীর বন—আমরা আমলকী ফল কুড়িয়ে খেতে খেতে এলাম। প্রিণ্ডোলা গাঁয়ের পাটোয়ারী আমাদের জন্যে মুড়কী ও দুধ নিয়ে এল। উড়িষ্যার এই গভীর জঙ্গলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেচে।

জায়গাটা অতীব গভীর অরণ্যময়—কি অপূর্ব্ব নীল আকাশ অরণ্যের মাথায়—কি অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা···পাহাড়ের crag, তার ছায়ায় আমরা কতক্ষণ বসে রইলাম—ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে করে না—ইচ্ছা হয় না যে আর বেলপাহাড়ে ফিরি। আবার গাড়ীতে উঠি। আবার কলকাতায় যাই।

প্রিণ্ডোলা নামে একটা গাঁ পাহাড়ের পাদদেশে—এইখান দিয়ে বিক্রমখোল যেতে হয়। আমরা বেলা দশটার সময় এখানে পৌঁছলাম। একটু পরেই পাটোয়ারী গাড়ি করে এল। গাঁয়ের 'গাঁউঠিয়া' অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের নাম বিম্বাধর—সে তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে দুধ ও মুড়কী নিয়ে এল খাবার জন্যে। একটু বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলাম—দেখাশুনো করে ফিরে আবার গাঁয়েই এলাম। ওবেলাকার নাচের দল নাচ দেখালে। আমরা একটা ফটো নিলাম। আমাদের কোন অদৃষ্টপূর্ব্বক জীব ভেবে এখানকার লোকেরা ঝুঁকে পড়েচে—দলে দলে এসে আমাদের চারিপাশে দাঁড়িয়েচে। প্রমোদবাবু

মুখে সাবান মেখে দাড়ি কামাচ্ছে—এরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে—এ দৃশ্য আর কখনো দেখে নি বোধ হয়। ফটোগ্রাফ নেবার সুবিধার জন্য নাচ হল পথের ওপর—ঝন্‌-ঝন্‌ করচে রোদ—নাচওয়ালীদের মুখের ওপর বড় রোদ্দুর পড়েচে দেখে আমি পরিমলবাবুকে তাড়াতাড়ি **snap**টা সেরে নিতে বললুম।

নাচ গান শেষ হল। প্রমোদবাবু, পরিমলবাবু ও কিরণ হেঁটে রওনা হলেন বেলপাহাড়ে। আমার পায়ে ফোস্কা পড়েচে বলে হাঁটতে পারা গেল না। গরুর গাড়িতে ওঁদের জিনিসপত্র নিয়ে আমি ঘণ্টা-খানেক পরে রওনা হলাম—আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি বাদে ভারতের সবটাই এই ধরনের ভূমি। **B. N. R.**-ই দেখ না কেন—সেই খড়গপুর থেকে আরম্ভ হয়েচে রাঙামাটি, পাহাড় ও শালবন—আর বরাবর চলেচে এই চারশ মাইল—এর পরও চলচে আরও চারশ মাইল—চারশ মাইল কেন, আরও আটশ মাইল বম্বে পর্য্যন্ত। অরণ্যের দৃশ্য সেখানে যেতে আরও গম্ভীর—সহ্যাদ্রির মহিমময় ঘাটশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যের তুলনা কোথায়। ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি—মালবার উপকূলের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট—আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি পার হয়েই অতুলনীয় হিমালয়, **Alpine meadows**, ভারতের প্রকৃতরূপই এই—এই রাঙামাটি, পাহাড়, শালবন—এই আসল ভারতবর্ষের রূপ। বাংলার সমতলভূমিতে সারা জীবন কাটিয়ে আমরা ভারতের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারি নে। অবশ্য বাংলার রূপ অন্য রকম, বাংলা কমনীয়, শ্যামল, ছায়াভরা। সেখানে সবই যেন মৃদু ও সুকুমার—গাছপালা থেকে নারী পর্য্যন্ত। এসব দেশের মত রুক্ষ ভাব ওখানে তো নেই।

মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। কি জ্বলজ্বলে নক্ষত্রগুলো—যেন হীরের টুকরোর মত জ্বলচে!···বিরাট—বিরাট প্রকৃতি এখানে শিবমূর্তি ধরেচে। কমনীয় নয়, সুষ্ঠু নয়, কিন্তু উদার মহিমময় বিরাট। বিরাট **is the terms for it.**

হঠাৎ খুকীটার কথা মনে পড়ে গেল। ওর সেই অবোধ, অনাদৃত হাসিটুকুর কথা মনে পড়ল। এই বিরাট প্রকৃতি, ওই নক্ষত্রজগৎ,

বিশাল উদার Space-এর মধ্যে ওর স্থান কোথায় ? মরে সে কোথায় গেল ? তার ক্ষুদ্র জীবনীশক্তি নিয়ে ও কি এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত। **Poor mite, what chance had she—a helpless thing ?**

কিন্তু বনের এই হলদে তিলের ফুলের থোকা—প্রথম বসন্তে যা থোকা থোকা ফুটেচে—তা দেখলে মনে আশা জাগে। আমি বলতে পারি—এই বিরাটতার সঙ্গে মঙ্গল মিশে আছে, এই মহিমময় সন্ধ্যায় আত্মার সত্যদৃষ্টি খুলে যায়। বুদ্ধি দিয়ে সে জিনিস বোঝা যায় না, তর্কযুক্তির পথে তা ধরা দেয় না—তা প্রাণের মধ্যে আপনা-আপনি ফুটে ওঠে, নির্জ্জন ধ্যানের মধ্যে দিয়ে—অপূর্ব্ব আনন্দের মধ্যে দিয়ে। মুখে বলে সে সব বোঝানো কি যায় ?

ফিরে দেখি ডাকবাংলোতে ওরা আসে নি। আমি একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সামনে চাঁদ উঠেচে নক্ষত্র জ্বলচে। অনেকক্ষণ পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে। আমি একটা শালপাতার পিকা আনিয়ে খেলাম।

সারারাত্রি আমরা গল্প করে জাগলাম। শেষ রাত্রে আমি কয়েক-বার উঠে এসে বাইরে দাঁড়ালাম—চাঁদ দূরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত গেল। রাঙা হয়ে গেল চাঁদটা—অদ্ভুত দেখতে হয়েচে! ··

অনেক রাত্রে আমরা স্টেশনে এলাম। বেজায় শীত। ভোরবেলার দিকে ট্রেনটা এল। রাতে কি কষ্ট—মালের বস্তার ওপর বসে বসে ঢুলছিলাম—পরিমলবাবুকে জায়গাটা ছেড়ে দিলাম।

ভোর হল কুলুঙ্গা স্টেশনে। কি অপূর্ব্ব পর্ব্বতের ও জঙ্গলের দৃশ্য! এমন **wilderness** আমি খুব কমই দেখেচি। যে স্টেশনে আসি—সেটাই মনে হয় আগেকার চেয়ে ভাল। নোটবুকে বসে নোট করি, কি কি সেখানে আছে। গোইলকেরা স্টেশনটি বড় সুন্দর লাগল। শাল জঙ্গল, পাহাড়, স্থানটাও অতি নির্জ্জন। বাংলাদেশের কাছে যত আসি ততই সমতল প্রান্তর বেশী। খড়্গপুরের ওদিকে কলাইকুণ্ডা জায়গাটি এ হিসাবে বেশ ভাল।

বাংলাদেশে গাড়ি ঢুকল। তখন বেলা একেবারে চলে গেছে। এ আর এক রূপ, অতি কমনীয়, শান্ত শ্যামল। চোখ জুড়িয়ে যায়, মন শান্ত হয় কিন্তু এর মধ্যে কোন বিরাটত্ব নেই, **majesty** নেই হৃদয় মন বিস্ফারিত হয় না, কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠে অসীমতার দিকে ছুটে চলে না। এতে মনে তৃপ্তি আসে—ছোটখাটো ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথা ভাবায়, নানা পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—মানুষ যা নিয়ে ঘরকন্না করতে চায় তার সব উপকরণে যোগায়। হাসি অশ্রু মাখানো লজ্জাবনতা পল্লীবধূটি যেন—তার সবই মিষ্টি কমনীয়। কিন্তু মানুষের মন এ ছাড়া আরও কিছু চায়,আরও উদ্দাম, অশান্ত, রুদ্র ভাব চায়। বাংলাদেশে তা যেন ঠিক মেলে না। হিমালয়ের কথা বাদ দি—সেটা বাংলার নিজস্ব একচেটে জিনিস নয়—আর তার সঙ্গে সত্যিকার বাংলার সম্বন্ধই বা কি? পদ্মা?···সেও অপূর্ব্ব, সন্দেহ নেই—কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনী বধূ, একগুঁয়ে তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী, যা খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না—সবাই ভয় করে চলে—খামখেয়ালী—রূপবতী—তবে মিষ্টি নয়—**high bred** রূপ ও চাল চলন। ঘরকন্না পাতিয়ে নিয়ে থাকবার পক্ষে তত উপযোগী নয়।

কলকাতা ফিরে পরদিনই নীরদবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ হল সন্ধ্যায়। আমার আবার একটু দেরি হয়ে গেল। সুনীলবাবু মাঝের দিন আমার বাসায় এসেছিলেন—বঙ্গশ্রী অফিসে আমায় **Phone** করেছিলেন—যাবার সময় পার্ক সার্কাস থেকে ওঁর বাসা হয়ে গেলাম। সতীশের সঙ্গে একটা আফিমের দোকানে আজ আবার দেখা হল। কদিন ধরেই উড়িষ্যা ও মানভূমের সেই স্বপ্নরাজ্য মনে পড়েচে—বিশেষ করে মনে পড়চে আসানবনী ও টাটানগরের মধ্যবর্ত্তী সেই বনটা—যেখানে বড় বড় পাথরের চাঁই-এর মধ্যে শালের জঙ্গল—পত্রহীন দীর্ঘ গাছগুলিতে হলদে কি ফুল ফুটে আছে—কেবলই ভাবচি ওইখানে যদি একটা বাংলো বেঁধে বাস করা যায়—ওই নির্জ্জন মাঠ, বন, অরণ্যানীর মধ্যে!

অপরাহ্নে ও জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে তাদের রূপ ভাবলেও মন অবশ হয়ে যায়।

সকালে উঠে দীনেশ সেনের বাড়িতে এক বোঝা পরীক্ষার কাগজ পেশ করে এলুম। সারা পথে মুচ্‌কুন্দ চাঁপার এক অদ্ভুত গন্ধ! বিজয় মল্লিকের বাগানে একটা গাছে কেমন থোকা থোকা কাঁচা সোনার রঙের ফুল ধরেচে। বড় লোভ হল—ট্রাম থেকে নেমে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বললাম—ঐ গাছতলাটায় একবার যেতে পারি? সে বললে—নেহি। সংক্ষেপে বললে, আমায় সে মানুষ বলেই মনে করলে না! আবার বললুম—দু একটা ফুল নিয়ে আসতে পারি নে? তলায় তো কত পড়ে আছে। সে এবার অত্যন্ত **contemptuous** ভাবে আমার দিকে চেয়ে পুনরায় সংক্ষেপে বললে—নেহি।

ভাল, নেহি তো নেহি—গড়ের মাঠে খিদিরপুর রোডের ধারে অনেক মুচুকুন্দ ফুলের গাছ আছে, ট্রামে আসবার সময় দেখে এসেচি, সেখান থেকে কুড়িয়ে নেব এখন।

তারপর এলাম নীরদবাবুর বাড়ি। সেখানে খানিকটা গল্পগুজব করে গেলাম শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি। পাশের বৈঠকখানায় রমাপ্রসাদবাবু আছেন দেখলাম—শ্যামাপ্রসাদবাবুও তাঁর লাইব্রেরী ঘরে কি কাজ করছিলেন। সেখানে খানিকটা থাকার পরে বাসায় ফিরলাম।

বৈকাল বেলা। আজ রামনবমী। কতদিনের কথা মনে পড়ে। বৈকালে বসে বসে তাই ভাবছিলাম—বেলা পড়ে এসেচে—কত পাপিয়ার ডাকভরা এই সময়ের সেই পুরাতন দুপুরগুলো।...বাঁশের শুকনো পাতার কথা কেন এত মনে হয় তা বুঝতে পারি নে। সুভদ্রাকে কাল যখন পত্র লিখলুম—তখনও বাঁশবনের কথা ও শুকনো পাতার রাশির কথাই মনে এল। পাপিয়ার গানের কথা বিশেষ করে মনে আছে। এই সব দিনের অতীত দুপুরগুলোর সঙ্গে পাপিয়ার গান জড়ানো আছে, আর জড়ানো আছে অদ্ভুত ধরনের

wild আনন্দ!...

বেলা পড়ে এসেচে। গোসাঁই-পাড়ার নারকোলতলায় আজও তেমনি মেলা বসচে, অতীত দিনের মত। বাদা ময়রা মুড়কি ও কদ্মা বিক্রী করচে, গোপালনগর থেকে হয়তো যুগল ও হাজরা ময়রা তাদের তেলে-ভাজা জিবে-গজা ও জিলিপীর দোকান নিয়ে এসেচে।

বাবার সেই শ্লোকটা—অনেক কালের সেই আমবনের ছায়ায় উচ্চারিত শ্লোকটা আজও আমার মনে আছে। পুরনো খাতাখানা আজও আছে, নষ্ট হয় নি।

সকালবেলা। নেড়াদের ছাদে বসে লিখচি; গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে এসেচি।

বাস্তবিকই গ্রামের লোকের সংকীর্ণতা এত বেশী—মনকে বড় পীড়া দেয়। এদের মন চারিধার থেকে শৃঙ্খলিত—খুলবার অবকাশ নেই। আবালবৃদ্ধ-বণিতার এই দশা দেখচি, এদের আচার শুষ্ক ও সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত—স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

কাল বিকেলে নদীর ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ একলা বসে ছিলাম। বাংলা দেশের, বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের প্রকৃতির এই যে সৌন্দর্য্য—এ অন্য ধরনের। কিছুদিন আগে আমি উড়িষ্যায় গিয়ে সেখানকার বন পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের কথা যা লিখেছিলাম—এখানে বসে মনে মনে বিচার করে দেখে আমি বুঝলাম তার অনেক কথা আমি ভুল লিখেছিলাম। বাংলার সৌন্দর্য্য **more tropical**—এখানে অল্প একটু স্থানের মধ্যে যত বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা ও লতা আছে—ওসব দিকে তা নেই। এখানে বৈচিত্র্য বেশী। নীল আকাশ ওখানেও খোলে—মনে অন্যরকম ভাব আনে, তা মহনীয়, বিরাট—এ কথা ঠিকই। কিন্তু বাংলার আকাশ—বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কি গ্রাম্য নদীর উপরকার যে আকাশ—তার সৌন্দর্য্য মনে অপূর্ব্ব শিল্পরসের সৃষ্টি করে—মনে বৈচিত্র্য আনে। হয়তো বিরাটতা নেই, ঠিকই—কিন্তু **Poetry of Life** এতে যেন বেশী। বাঁশগাছে ও

শিমূলগাছে এ দেশের, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের, সৌন্দর্য্যকে এক অভিনব রূপ দিয়েচে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এর সঙ্গে গ্রামে জোটে কচি উলুবন ও আউশ ধানের ক্ষেত। এত সবুজের সমাবেশ আর কোথাও দেখিনি—**a feast of green**—তবে গ্রামের মধ্যে মুক্ত আকাশ বড় একটা দেখা যায় না,—ওই একটা দোষ। বড় চাপা। কিন্তু মাঠে, নদীর ধারে—মুক্তরূপা প্রকৃতি যেমনি লীলাময়ী তেমনি রূপসী। উদার প্রান্তর, উদার আকাশ—নানা বর্ণের মেঘের মেলা অস্তদিগন্তে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মেঘ-চাপা গোধূলির আলোয়, গাছপালায়, শিমূলগাছের মাথায়, নদীজলে, উলুখড়ের মাঠে কি যে শোভা!···

একথা জোর করে বলতে পারি বিক্রমখোলের পাহাড় ও বনের ওপারে যে আকাশ দেখেছিলাম—মাধবপুরের চরের ওপারের বৈকালের আকাশ তার চেয়ে মনে অনেক বেশী বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে।

এইমাত্র নাগপুর শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মালভূমিতে মোটরে বেড়িয়ে ফিরে এলাম। একথা ঠিকই যে বাংলার রূপ যতই সুন্দর হোক, বিরাটতায় ও গম্ভীর মহিমায় এসব দেশের কাছে তা লাগে না। উড়িষ্যার বন-পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের চেয়েও এর সৌন্দর্য্য বিরাট ও **majestic**। বাংলা দেশের রূপ নিতান্তই নিরীহ পল্লীবধূর মত লাবণ্যময়ী, লাজুক টিপ-পরা ছোট্ট মুখটি। কিন্তু এদেশের **high-land**-এর রূপ গর্ব্বদৃপ্ত সুন্দরী রাজরানীর মত।

"Pure Logical thinking can give us no knowledge whatever of the world of experience. The Knowledge of reality begins with experience and terminates with it. Reason gives the structure to the system and the data of experience and their mental relations are to correspond exactly with the consequences in the theory."

Einstein.

Herbert Spencer Lecture, Oxford, 1933

Lucian's Satires,

Celsac (178 A. D.) writes :—

"Christians are like a council of frogs in a marsh. Their Teachers are mainly weavers and cobblers, who have no power over men of education and taste. The qualification for conversion are ignorance, and childish timidity. Like all quacks they gather a crowd of slaves, children, women and idlers."

Senecca—Economy,

"He is born to serve but few, who thinks only the people of his own age. Many thousands of years, many generations of men are yet to come: look to these, though from some cause silence has been imposed on all of your own day; then will come those who may judge without offence and without favour."

[আমি 'অপরাজিত'-র এক স্থানে অবিকল এই ভাবই ব্যক্ত করেচি। অনেক পূর্ব্বেই করেচি—তখন তো আমি সেনেকার এ উক্তিগুলি পড়ি নি—কিন্তু কি চমৎকার মিল আছে !]

অনেকদিন লিখি নি, মনে ছিল না। হঠাৎ আজ মনে হল তাই সামান্য একটুকু লিখে রাখলাম। আজকার তারিখটা অন্ততঃ খাতায় থাকুক।

আজ বৈকালে নাগপুর এসে পৌঁচেচি। এবার পূজোয় এখানেই আসবো ঠিক করে রেখেছিলাম। আজ সারাদিন গাড়ির ঝাঁকুনিতে

বড় কষ্ট হয়েচে। গত মাসকয়েক আগে যে বেলপাহাড়ে এসেছিলাম সে স্টেশনটা আজ রাতে···শেষ রাতে বেরিয়ে চলে গেছে, দেখতে পাই নি। বিলাসপুর পর্য্যন্ত তো বেশ এলাম। বিলাসপুর স্টেশনে আমরা চা খেলাম। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুর পর্য্যন্ত প্রায় একই একঘেয়ে দৃশ্য···সীমাহীন সমতলভূমি এক চক্রবালরেখা থেকে অন্য চক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দৃশ্য বড় একঘেয়ে, প্রায়ই ধানের ক্ষেত ও জলাভূমি—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শালবন। রাঙামাটিও সব জায়গায় নেই। বেলপাহাড়ের মত পাহাড় ও জঙ্গল এ পথে কোথাও নেই—এক ডোঙ্গরগড় ছাড়া। ডোঙ্গরগড় ছাড়িয়ে তিন-চারটা স্টেশন পর্য্যন্ত দৃশ্য ঠিক আমি যা চাই তাই। উভয় পাশে ঘন অরণ্য, শাল, খয়ের ও বন্যবাঁশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, পর্বতমালা। উড়িষ্যার বনের চেয়েও এ বন অধিকতর গভীর কিন্তু এইটুকু যা, তারপর আবার সেই একঘেয়ে সমতলভূমি—নাগপুর পর্য্যন্ত। বাংলাদেশে এত অনন্তপ্রসারী দিক্‌-চক্রবাল দেশের কল্পনাও করতে পারা যায় না।

এই সব স্থানে জ্যোৎস্না রাত্রে ও অল্প রাত্রে যে অদ্ভুত দেখতে হবে তা বুঝতে পারলাম—তবু মনে হল বনভূমির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য যা বাংলাদেশে আছে, তা এসব অঞ্চলে নেই। বাংলার সে কমনীয় আপন-ভুলানো রূপ এদের কৈ? এখানকার যা রূপ তা বড় বেশী রুক্ষ। অবশ্য ডোঙ্গরগড় স্টেশন ছাড়িয়েই যে পাহাড় পড়ে—এমন অনাবৃত শিলাস্তূপ, এত গম্ভীর-দর্শন উন্নতভূমি বাংলার কোথাও নেই একথা ঠিক—কিন্তু বাংলায় যা আছে, এখানকার লোকে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

বৈকালে নাগপুরে কোতোয়াল সাহেবের বাংলোয় এসে উঠলাম। তারপর চা খেয়ে আমি ও প্রমোদবাবু বেড়াতে বেরুলাম। শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটা বড় পাহাড় আছে, শালবনে আবৃত, নীচে দিয়ে মোটরের পথ আছে। দুজনে সেখানে একটা শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলাম। হাওয়া কি সুন্দর! দুজন ভদ্রলোক পথে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের চেহারা দেখে আমার মারহাট্টি সেনানায়ক ভাস্কর

পণ্ডিতের কথা মনে পড়ল।

সন্ধ্যাতারা উঠেচে। পাহাড়ের বনভূমি অন্ধকার হয়ে এল। দূরে বনের মাথার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম—ওদিকে সাতশ মাইল প্রান্তর অরণ্য, নদী পার হয়ে তবে বারাকপুর। হাটবার, আজ রবিবার, সন্ধ্যা হয়েচে, কাঁচিকাটার পুল দিয়ে গণেশ মুচি হাট করে ফিরচে, আর বলতে বলতে যাচ্চে—হাটে বেগুন আজ খুব সস্তা।

—এত জায়গা থাকতে ও জায়গায় কথা আমার এত মনে হয় কেন?

আর মনে পড়ে আমাদের পোড়ো ভিটের পশ্চিম ধারের সেই কি অজানা গাছগুলো, যার সঙ্গে বাল্য থেকে আমার কত পরিচয়—ওগুলোর কথা মনে কল্পনা করলেই আবার আমার বারো বছরের মুগ্ধ শৈশব যেন ফিরে আসে।

কাল বৈকালে এখানকার মহারাজবাগ ও মিউজিয়াম দেখলাম। মিউজিয়ামে অনেক পুরনো শিলাখণ্ড আছে—কয়েকটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর। বিলাসপুর জেলায় একটা ডাকাতের কাছে পাওয়া কতকগুলো তীর দেখলাম, ভারী কৌতুহলপ্রদ জিনিস বটে। একটি জীবন্ত অজগর সাপ দেখা গেল। মহারাজবাগে একটা বড় সিংহ আছে, কিন্তু সে-সব যতই ভাল লাগুক, সে-সব নিয়ে আজ লিখব না। আজ যা নিয়ে লিখতে বসেচি, তা হচ্চে আজকার বিকেলের মোটর-ভ্রমণটি।

নাগপুর শহরের চারিধারে যে এমন অদ্ভুত ধরণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট স্থান আছে সে-সব কথা আমি কখনও জানতুম না। কেউ বলেও নি। শহরের উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপরকার রাস্তা দিয়ে আজ আমরা মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম। যোধপুরী ছাত্রটি আমাদের নিতে এসেছিল। সে যে কি অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য, তা লিখে প্রকাশ করতে পারি নে। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অস্তদিগন্ত রঙে রঙে রঙীন। বহুদূরে দূরে, উচ্চ মালভূমির সুদূর প্রান্ত সান্ধ্যছায়াচ্ছন্ন, দিক্‌চক্রবালরেখা নীল শৈলমালায় সীমাবদ্ধ, সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে যেদিকে

চাই. ধু ধু বৃক্ষহীন, অন্তহীন উচ্চাবচ মালভূমি, শৈলমালা, শিলাখণ্ড,—দু-চারটা শালপলাশের গাছ। মাথার উপর অপূর্ব্ব আকাশ, ঈষৎ ছায়াভরা কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে—পিছনের পাহাড়টি ক্রমে গাড়ির বেগে খুব দূরে গিয়ে পড়চে, তার ওপরকার বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসচে—সামনের শৈলমালা ফুটে উঠেছে—ক্রমে অনেক দূরে সিতাবলডির পাহাড় ও বেতার টেলিগ্রাফের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। তার নীচে চারিদিকের মালভূমি ও পাহাড়ে ঘেরা একটা খাঁজের মধ্যে নাগপুর শহরটা। এমন একটা মহিমময় দৃশ্যের কল্পনা আমি জীবনে কোনদিনই করতে পারি নি—বাংলাদেশ এর কাছে লাগে না—এর সৌন্দর্য্য যে ধরনের অনুভূতি ও পুলক মনে জাগায়, বাংলাদেশের মত ভূমিসংস্থান যে সব দেশের সে সব দেশের অধিবাসীদের পক্ষে তা মনে কল্পনা করাও শক্ত। উড়িষ্যার দৃশ্যও এর কাছে ছোট বলে মনে হয়——সেখানে জঙ্গল আছে, বুনো বাঁশের ঝাড় আছে বটে, কিন্তু এ ধরনের অবর্ণনীয় সুমহান, বিরাট, রুক্ষ সৌন্দর্য্য সেখানকারও নয়। তখন আমি এমন দেখি নি, কাজেই উড়িষ্যাকেই ভেবেছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চরমতম সৃষ্টি। আমি বনশ্রী খুব ভালবাসি, বন না থাকলে আমার চোখে সে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নয়—কিন্তু বন না থাকলেও যে এমন অপূর্ব রূপ খুলতে পারে, এমন **superb** অনুভূতি মনে জাগতে পারে তা আমার ধারণাও ছিল না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেচে। এখানে পাহাড়ের ওপর দুটো হ্রদ আছে, একটার নাম আম্বাজেরী আর একটার নাম কি বললে যোধপুরী ছাত্রটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। দুটোই বড় সুন্দর—অবিশ্যি আম্বাজেরী হ্রদটা অনেক বড় ও সুন্দরতর। এ হ্রদের সামনে কলকাতার ঢাকুরে লেককে লজ্জায় মুখ লুকাতে হয়। এর গম্ভীর মহিমার কাছে ঢাকুরিয়া লেক বাল্মীকির কাছে ভারতচন্দ্র রায়। এর কি তুলনা দেব? ম্লান জ্যোৎস্না উঠল। যোধপুরী ছাত্রটি লোক ভাল, কিন্তু তার দোষ সে অনবরত বকচে। প্রমোদবাবু তার নাম রেখেচেন 'মূলো'—সে চুপ করে থাকলে আমরা আরও অনেক বেশী উপভোগ করতে

পারতুম।

আসবার পথটিও বড় চমৎকার—পথ ক্রমে নেমে যাচ্চে—দুধারে সেই রকম **immensity**। মনে হল আজ পূজার মহাষ্টমী—দূর বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনই সন্ধ্যায় মহাষ্টমীর আরতি সম্পন্ন হয়ে গেছে, প্রাচীন পূজার দালানে নতুন জামা-কাপড় পরে ছেলে-মেয়েরা মুড়িমুড়কি, নারকোলের নাড়ু কোঁচড়ে ভরে নিয়ে খেতে খেতে প্রতিমা দেখচে। বারাকপুরের কথা, তার ছায়াঘেরা বাঁশবনের কথাও এ সন্ধ্যায় আজ আবার মনে এল। সজনে গাছটার কথাও—সেই সজনে গাছটা।

মহাষ্টমীতে আজ ক্র্যাডক্-টাউনে প্রবাসী বাঙালীদের দুর্গোৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। নাগপুরে বাঙালী এত বেশী তা ভাবি নি; ওরা প্রসাদ খাবার অনুরোধ করলে—কিন্তু নীরদবাবুকে রুগ্ন অবস্থায় বাসায় রেখে আমরা কি করে বেশীক্ষণ থাকি?

মারাঠী মেয়েরা রঙীন শাড়ি পরে সাইকেলে চেপে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। আমরা মহারাজবাগের মধ্যের রাস্তা দিয়ে এগ্রিকালচারাল কলেজের গাড়িবারান্দার নীচে দিয়ে ভিক্টোরিয়া রোডে এসে পৌঁছুলুম। রাত সাড়ে সাতটা, জ্যোৎস্না মেঘে ঢেকে ফেলেচে।

সেদিন বনগাঁয়ে ছকু পাড়ুইর নৌকাতে সাতভেয়েতলা বেড়াতে গিয়েছিলাম—এবার বর্ষায় ইছামতী কূলে কূলে ভরে গিয়েছে—দুধারের মাঠ ছাপিয়ে জল উঠেচে—তারই ধারের বেতবন, অন্যান্য আগাছার জঙ্গল বড় ভাল লেগেছিল। অত সবুজ, কালো রংয়ের ঘন সবুজ,—বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না, বনের অত বৈচিত্র্য ও রূপ কোথাও নেই—নীল আকাশের তলায় মাঠ, নদী, বনঝোপ বেশ সুন্দর লেগেছিল সেদিন। কিন্তু আজ মনে হল সে যত সুন্দর হোক, তার বিরাটতা নেই—তা **pretty** বটে, **majestic** নয়।

চারিধারে জঙ্গলাবৃত—গাছপালার মধ্যে হ্রদটা। হ্রদের বাংলোতে বসে লিখচি। প্রমোদবাবু বলচেন, সূর্য্য ঢলে পড়েচে শীগগির লেখা

শেষ করুন। এখান থেকে আমরা এখন রামটেক্ যাব। কি গভীর জঙ্গল-টাতে এইমাত্র বেড়িয়ে এলাম—বুনো শিউলি, কেঁদ, আবলুস, সাঁইবাবলা সব গাছের বন। সামনে যতদূর চোখ যায় নীল পর্ব্বতমালা বেষ্টিত বিরাট হ্রদটা। এমন দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেচি। পাহাড়ে যখন মোটরটা উঠল—তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করবার নয়। সময় নেই হাতে, তাই তাড়াতাড়ি যা-তা লিখচি। সূর্য্য ঢলে পড়েচে—এখনও এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী রামটেক্ দেখতে যাব। প্রমোদবাবু তাগাদা দিচ্চেন। বনশিউলি গাছের সঙ্গে বনতুলসী গাছও আছে—কিন্তু তা পাহাড়ের বাইরের ঢালুতে। একটা সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। মোটরওয়ালা কোথায় গিয়েছে—হর্ন দিচ্চি—এখনও খোঁজ পাই নি। পাহাড়ের গায়ে ছায়া পড়ে এসেচে। দূরের পাহাড় নীল হতে নীলতর হচ্চে। এখানে হ্রদের সাজানো বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বাংলোয় চৌকিদারের কাছ থেকে জল চেয়ে দুজনে খেলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হয় হয়। ড্রাইভারটা কোথায় ছিল—হর্ন দিতে দিতে এল। প্রামাদবাবু ছড়ি ফেলে এসেছেন—হ্রদের ঘাটে নেমে আনতে গেলেন। ফিরে বললেন—ছায়া আরও নিবিড়তর হয়েছে বনের মধ্যে। অপরাহ্নের ছায়ায় বন আরও সুন্দর দেখাচ্চে। ওখান থেকে মোটর ছেড়ে শৈলমালাবৃত সুন্দর পথে রামটেক্ এলাম। রামটেক্ যখন এসেচি, তখন বেলা আর নেই, সূর্য্য অস্ত গেছে। অপরাহ্নের ছায়ায় রামটেকের সুবৃহৎ উপত্যকা ও ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যাবৃত শান্ত অধিত্যকাভূমির দৃশ্য আমাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দর মনে হল যে, আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। এই সুন্দর গিরিসানুদেশ এখনি জ্যোৎস্নায় শুভ্র হয়ে উঠবে, এই নির্জ্জনতা, সেই প্রাচীন দিনের স্মৃতি—এসব মিলে এখনি একে কি অপরূপ রূপই দেবে—কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছতে দেরি করে ফেলেচি, বেশীক্ষণ এই ছায়াভরা ধূসর সানুশোভা উপভোগ করতে তো পারব না। পথ খুব চওড়া পাথরে বাঁধানো—কিন্তু উঠেই চলেচি, সিঁড়ি আর শেষ হয়

না। প্রথমে একটা দরজা, সেটা এমন ভাবে তৈরী যে দেখলে প্রাচীন আমলের দুর্গদ্বার বলে ভ্রম হয়। তারপর একটা দরজা, তারপর আর একটা—সর্ব্বশেষে মন্দির। মন্দির প্রবেশ করে বহিরাঙ্গণের প্রাচীরের ওপরকার একটা চবুতারায় আমরা বসলাম। নীচেই বাঁ ধারে কিন্‌সী হ্রদ, পূর্ব্বে পূর্ণচন্দ্র উঠচে, চারিধারে থৈথৈ করছে বিরাট Space, পশ্চিম আকাশ এখনও একটু রঙীন। মন্দিরে আরতির সময়ে এখানে নহবৎ বাজে, এক ছোকরা বাইরে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসে সানাই বাজাতে শুরু করলে। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

একটু পরে জ্যোৎস্না আরও ফুটল। আমাদের আর উঠতে ইচ্ছে করে না, প্রমোদবাবু তো শুয়েই পড়েচেন। দূরে পাহাড়ের নীচে আম্বারা গ্রামের পুকুরটাতে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্ চিক্ করচে। মন্দির দেখতে গেলাম। খুব ভারী ভারী গড়নের পাথরের চৌকাঠ, দরজার ফ্রেম - সেকেলে ভারী দরজা, পেতলের পাত দিয়ে মোড়া মোটা গুল্ বসানো। মন্দিরের দুপাশে ছোট ছোট ঘর পরিচারক ও পূজারীরা বাস করে। তাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করচে, মেয়েরা রান্নাবাড়া করচে। রামসীতার মন্দিরের দরজার পাশে অনেকগুলি সেকেলে বন্দুক ও তলোয়ার আছে। একজনকে বললুম—এত বন্দুক কার? সে বললে—ভোঁস্‌লে সরকারকা। ১৭৮৩ সালে রঘুজী ভোঁসলা এই বর্ত্তমান মন্দির তৈরী করেন। আম্বারা সরোবরের পাশে ভোঁস্‌লাদের বিশ্রামাবাসের ধ্বংসাবশেষ আছে, আসবার সময় দেখে এসেচি। মন্দিরের পিছনের একটা চবুতারায় দাঁড়িয়ে উঠে নীচে রামটেক্ গ্রামের দৃশ্য দেখলাম—বড় সুন্দর দেখায়! রামটেক্ ঠিক গ্রাম নয়, এমটা ছোট গোছের টাউন।

মন্দির প্রদক্ষিণের পর পাহাড় ও জঙ্গলের পথে আমরা নেমে এলাম। জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় বনময় সানুদেশ ও পাষাণ বাঁধানো পথটি কি অদ্ভুত হয়েচে। এখানে বসে কোন ভাল বই পড়বার কি চিন্তা করবার উপযুক্ত স্থান। এর চারিধারেই অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যময় গলিঘুঁজি, উচ্চাবচ ভূমি, ছায়াভরা বনান্ত দেশ। আমার পক্ষে তো

একেবারে স্বর্গ। ঠিক এই ধরনের স্থানের সন্ধানই আমি মনে মনে করেছি অনেকদিন ধরে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের থেকে এর সৌন্দর্য্য অনেক বেশী, যদিও চন্দ্রনাথের মত এ পাহাড় অতটা উঁচু নয়। আম্বারা গ্রামটি আমার বড় ভাল লাগল—চারিধারে একেবারে পাহাড়ে ঘেরা, অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান, গোলা ঘর, একটা সরাইও আছে। ইচ্ছে হলে এখানে এসে থাকাও যায়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নামতে পারলাম না, যদিও প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হচ্ছিল, মোটর ড্রাইভার হয়তো কি মনে করবে। বেচারী সারাদিন কিছু খায় নি। আম্বারা গ্রামটা দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি মোটর ছেড়ে সেই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে, কাটা পথটা ঘুরে রামটেক্ টাউনের মধ্যে ঢুকল। পাহাড়ের ঢালুতে বন্য আতাবৃক্ষ অজস্র, এখানে বলে সীতাফল—নাগপুর শহরে যত আতাওয়ালী আতা ফিরি করে—তার সব আতাই ফলে সিউনি ও রামটেক্ পাহাড়ে।

রাত বোধ হয় সাতটা কি সাড়ে সাতটা। মন্দিরের ওপরে চবুতারায় বসে দূরে নাগপুরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখেছিলাম ঠিক সন্ধ্যায়—তাই নিয়ে প্রমোদবাবুর সঙ্গে তর্ক হল, আমি বললুম —ও কাম্‌টির আলো—প্রমোদবাবু বললেন—না, নাগপুরের ?

কিন্‌সী হ্রদের বাংলোতে খাবার খেয়েছিলাম, কিন্তু চা খাই নি। রমেটেকের মধ্যে ঢুকে একটা চায়ের দোকানে আমরা গাড়িতে বসে চা খেলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—রামটেকের পাহাড়ের ওপর সাদা মন্দিরটা জ্যোৎস্নায় বড় চমৎকার দেখাচ্চে—চা খেতে খেতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, এতক্ষণ বারাকপুরে আমার গাঁয়ে বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজচে। লক্ষ্মীপূজোর লুচিভাজার গন্ধ বার হচ্চে বাঁশবনের পথে—এতদূর থেকে সে-সব কথা যেন স্বপ্নের মত লাগে! রামটেকের পথ দিয়ে মোটর ছুটল। কিন্‌সী হ্রদ থেকে মোটরে আসবার সময়ে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, তেমনি আনন্দ পেলাম। সামনে তখন ছিল আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু পার্ব্বত্য প্রদেশের কঙ্করময় পথ, ডাইনে ছায়াবৃত

অরণ্যেভরা শৈলমালা—এখন ঠিক তেমনি পথ দিয়ে মোটর তীরের বেগে ছুটে চলেচে—প্রমোদবাবু বললেন, **a glorious drive.**

রামটেক্ স্টেশনে নাগপুরের ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুতরাং বোঝা গেল এখনও সাড়ে আটটা বাজে নি। একটু গিয়ে প্রমোদবাবু মাইল স্টোনে পড়লেন—নাগপুর ২২৮ মাইল, মান্‌সার ২ মাইল। দেখতে দেখতে ডাইনে মান্‌সারের বিরাট ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় পড়ল—জ্যোৎস্নার আলোতে সুউচ্চ অনাবৃতকায় পাহাড়গুলো যেমনি নির্জ্জন, তেমনি বিশাল ও বিরাট মনে হচ্ছিল। মনে ভাবছিলাম ওই নির্জ্জন শৈলশিখরে, এই ঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ফুট-ফুটে জ্যোৎস্নায় তাঁবু খাটিয়ে যারা রাত্রিযাপন করে একা একা—তাদের জীবনের অপূর্ব্ব অনুভূতির কথা। আরও ভাবছিলাম এই জ্যোৎস্নায় বহুদূরের বাংলাদেশের এক ছোট্ট নদীর ধারের গ্রামের একটা দোতলা বাড়ির কথা। ভাবলাম, অনেকদিন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে এখন আরও কাছে কাছে থাকে—যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে—হয়তো আজ এই জ্যোৎস্নারাত্রে আমার কাছে কাছেই আছে। মান্‌সারে যেখানে নাগপুর-জব্বলপুর রোড থেকে রামটেকের পথটা বেঁকে এল—সেখানে একটা **P. W. D.** বাংলো আছে, সামনে একটা পদ্মফুলে ভরা জলাশয়। স্থানটি অতি মনোরম। দুপুরে আজ এই ম্যাঙ্গানিজগুলি আমরা দেখে গিয়েছিলাম—বিরাট পর্ব্বতের ওপর মোটর গাড়ী উঠিয়ে নিয়ে গেল—অনাবৃতদেহ পর্ব্বতপঞ্জর রৌদ্রে চকচক করচে, খাড়া কেটে ধাতুপ্রস্তর বার করে নিয়েচে—সামনে **schist** ও **granite**—নীচের স্তরগুলোতে কালো ম্যাঙ্গানিজ। একজন ওদেশী কেরানী আমাদের সব দেখালে, সঙ্গে দু টুকরো ম্যাঙ্গানিজ দিলে কাগজ-চাপা করবার জন্যে। তারই মুখে শুনলাম এই ম্যাঙ্গানিজ স্তর এখান থেকে ২৫।২৬ মাইল দূরে ভাণ্ডারা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে—মাঝে মাঝে সমতল জমি, আবার পাহাড় ঠেলে ঠেলে উঠেচে। নাগপুর-জব্বলপুর রোডে অনেক পাহাড় পড়ে জব্বলপুরে যেতে ; সিউনির দিকেও পাহাড় ও জঙ্গল মন্দ নয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা

সুন্দর দৃশ্য নাগপুর-অমরাবতী রোডে। নাগপুর শহর থেকে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাজারগাঁও গ্রাম থেকে কানহোলি ও বোরিনদীর উপত্যকা-ভূমি ধরে যদি বারবার সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, তা হলে শৈলমালা, মালভূমি ও অরণ্যে-ঘেরা এক অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে।

মান্‌সার ছেড়ে আমরা নাগপুর-জব্বলপুর রোডে পড়লাম। দুধারে দূরপ্রসারী সমতলভূমি জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ করচে—আকাশে দু-দশটা নক্ষত্র—দূরে নিকটে বৃক্ষশ্রেণী। এখনও নাগপুর ২৫ মাইল। সারাদিন পাহাড়ে ওঠানামা পরিশ্রমের পর, হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস বেশ আরামপ্রদ বলে মনে হচ্চে। ক্রমে কামটি এসে পড়লাম। পথে কান্‌হান্ নদীর সেতুর উপর এসে মোটরের এঞ্জিন কি বিগড়ে গেল। আমরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীবক্ষের দিকে চেয়ে আর একটা সিগারেট ধরালাম। পেছনে রামটেক্ প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা কান্‌কান্ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—আমার ইচ্ছে ছিল ট্রেনে মোটরে একটা রেস হয়—কিন্তু তা আর হল না, ট্রেন ছাড়বার আগেই মোটরের এঞ্জিন ঠিক হয়ে গেল। কামটিতে এঞ্জিন আবার বিগড়ালো একবার, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠিক্ হল। তারপর আমরা নাগপুর এসে পড়লাম—দূর থেকে ইন্দোরের আলো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কিন্‌সী হ্রদের তীরের গিরিসাপুর জঙ্গল আমি এখনও ভুলি নি। শরতের নীল আকাশের তলায় সেই নিবিড় ছায়ানিকেতন অরণ্য প্রদেশটি আমার মনে একটা ছাপ দিয়ে গেছে। আহা! ঐ বনের শিউলি গাছগুলোতে যদি ফুল ফুটত, আরও যদি দু-চার ধরনের বনফুল দেখতে পেতুম—তবে আনন্দ আরো নিবিড় হত—কিন্তু এমনি কত দেখেচি, তার তুলনা নেই। বুনো বাঁশের ছোট ছোট ঝাড়গুলির কি শ্যামল শোভা! পূজোর ছুটি ফুরিয়ে যাবে, আবার কলকাতার লোকারণ্যের মধ্যে ফিরে যাব, আবার দশটা পাঁচটা স্কুলে ছুটব, আবার 'ক্যালকাটা কেবিনে' বসে অপকৃষ্ট চা ও ডিমের মামলেট খাব—তখন এই বিশাল পার্ব্বত্যকায় সরোবর, এই

শরতের রৌদ্র-ছায়াভরা কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা ঘন অরণ্যানী, এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত নির্জ্জন গিরিসানু—এই আম্বারা, কিন্‌সী, রামটেকের মন্দির-দুর্গ—এসব বহুকাল আগে দেখা স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে মনের কোণে উঁকি মারবে।

একটা কথা না লিখে পারচি নে। আমি তো যা দেখি, তাই আমার ভাল লাগে—বিশেষ করে যদি সেখানে বন থাকে। কিন্তু তবুও লিখচি আমি এ পর্য্যন্ত যত পাহাড় ও অরণ্য দেখেচি—চন্দ্রনাথ, ত্রিকূট, কাটনি অঞ্চলের পাহাড়—ডিগরিয়া ও নন্দন পাহাড়ের উল্লেখ করাই এখানে হাস্যকর, তবুও উল্লেখ করচি এইজন্যে যে, এই ডায়েরী-তেই কয়েক বছর আগে আমি নন্দন পাহাড়ের সুখ্যাতি করে খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা লিখেচি—এসব পাহাড় কিন্‌সী ও রামটেকের কাছে ম্লান হয়ে যায় সৌন্দর্য্য ও বিশালতায়।

কাল নাগপুর থেকে চলে যাব। আজ রাত্রে নির্জ্জন বাংলোর বারান্দাতে বসে জ্যোৎস্নাভরা কম্পাউণ্ডের দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' পড়চি। সেই পুরনো বইখানা, সিদ্ধেশ্বর-বাবুদের অফিসে কাজ করবার সময় টেবিলের ড্রয়ারে যেখানা লুকনো থাকত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চট করে একবার বার করে নিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, দূর দেশের বর্ণনা পড়ে ক্লান্ত ও রুদ্ধশাস চেতনাকে চাঙ্গা করে নিতুম। এখনও মনে পড়চে সেই ছোট টেবিলটা, তার ড্রয়ারটা, ডাইনে কাঠের পার্টিসনটা—সেই রোকড় খতিয়ানে স্তূপ, ফাইলের বোঝা।

কাল বৈকালে একা বেড়াতে বার হয়েছিলাম, কারণ সকালের বম্বে মেলে প্রমোদবাবু হাওড়া ফিরলেন। আমি তাঁকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হ'ল, তাঁর বাড়ি খড়গপুর, তিনি মতিকাকাকে চেনেন। বললুম, মতিকাকার কাছে আমার নাম বলবেন।

তারপর বৈকালে একা বার হলাম। **South Tiger Gap Road** দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে একটা মুক্ত জায়গায় সাঁকোর

ওপর বসলাম। সামনে ধু-ধু প্রান্তর, দূরে দূরে শৈলশ্রেণী—বাঁয়ে সাতপুরা, ডাইনে রামটেকের পাহাড় ও মানসারের ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে। একটু পরে সূর্য্য ডুবে গেল, পশ্চিম দিগন্তে কত কি রঙ ফুটল। আমার কেবলই মনে আসতে লাগল ঐ শ্লোকটা—'প্রস্থিতা দূরপন্থানং'···শ্লোকের টুকরোটার নতুন মানে এখানে বসেই যেন খুঁজে পেলাম। ভাবলাম আমার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, আরও অনেক পেছনে কাশী ও বিন্ধ্যাচল, মির্জ্জাপুর ও চুনার পড়ে আছে—পশ্চিম ঘেঁষে প্রাচীন অবন্তী জনপদ—পূর্ব্বে প্রাচীন দক্ষিণ কোশল, সামনের ঐ নীল শৈলমালা—যার অস্পষ্ট সীমারেখা গোধূলির শান্ত ছায়ায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে—ঐ হল মহাভারতের কিংবা নৈষধ চরিতের সেই ঋক্ষবান পর্ব্বত। এই যেখানে বসে আছি, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অমরাবতীর কাছে পদ্মপুর বলে গ্রামে কবি ভবভূতির জন্মস্থান। এ সব প্রাচীন দিনের স্মৃতি জড়ানো প্রান্তর, অরণ্য, শৈলমালা দিগন্তহীন মালভূমির গম্ভীর মহিমা, এই রকম সন্ধ্যায় নির্জ্জনে বসলেই মনকে একেবারে অভিভূত করে দেয়।

পূর্ব্বে চেয়ে দেখি হঠাৎ কখন পূর্ণচন্দ্র উঠে গেছে। তারপর জ্যোৎস্না-শোভিত Tiger Gap Road-এর বনের ধার দিয়ে শহরে ফিরে এলাম। শরতের রাত্রের হাওয়া বন্য শিউলির সুবাসে ভারাক্রান্ত ও মধুর। Lawrence Road-এর মোড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—তিনজন বাঙালী ছোকরার সঙ্গে দেখা—তারা আমায় বাংলোর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি ওখান থেকে চলে গেলাম সীতাবলডির বাজারে ঘড়ির দোকানে। সেখানে রেডিওতে কলকাতা Short Wave ধরেছে, বাংলা গান বাজচে—একটু পরে রেডিও স্টেশনের বিষ্ণু শর্ম্মা সুপরিচিত গলায় কি একটা গানের ঘোষণা করলে। মনে মনে ভেবে দেখলাম কত পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে ৭৫০ মাইলের ব্যবধান ঘুচিয়ে বিষ্ণু শর্ম্মার গলা এখানে এসে পৌঁছলো—যে মুহূর্ত্তে সে

গার্স্টিন প্লেসের সেই রাঙা বনাত মোড়া ঘরটায় বসে একথা বললে সেই মুহূর্ত্তেই! রেডিওর অদ্ভুতত্ব এভাবে কখনো অনুভব করি নি—কলকাতায় বসে শুনলে এর গভীর বিস্ময়ের দিকটা বড় একটা মনে আসে না।

তারপর টাঙা নিয়ে নেরুলকরের ওখানে গেলাম। ডাক্তার বেরিয়ে গিয়েচে—বসে বসে "The Story of Mount Everest" বইখানা পড়লাম—রাত দশটা বাজে, এখনও ডাক্তার এল না। আমি একটা চিঠিতে লিখে এলাম, কাল সকালে তুবেকে সঙ্গে নিয়ে যেন নেরুলকর আমাদের ওখানে আসে। তারপর একটা টাঙা নিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত স্টেশন দিয়ে ফিরলাম।

সকালে সীতাবল্‌ডির ঘড়ির দোকানে ঘড়ি সারাতে গেলাম—ওখান থেকে গেলাম ডাঃ নেরুলকরের ওখানে ও স্টেশনে বার্থ রিজার্ভ করতে। দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়ে গোঁড় জাতির অস্ত্রশস্ত্র, বালাঘাট পার্ব্বত্যদেশের খনিজ প্রস্তর, fossil, জব্বলপুরের অধুনালুপ্ত অতিকায় হস্তী, নর্ম্মদার উত্তরে অরণ্যের অধুনালুপ্ত সিংহ, বনবিড়াল, ঝিন্দ্‌ওয়ারা জঙ্গলের বাইসন বা গৌর—কত কি দেখলাম। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের চেদীরাণী লোহলের প্রস্তরলিপি ও বৌদ্ধ রাজা সূর্য্য ঘোষের পুত্র রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে মারা যাওয়াতে ভগবান তথাগতের উদ্দেশ্যে পুত্রের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তিনি যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন—সে লিপিটিও পড়লাম। আজ খুব রোদ, আকাশ খুব নীল, বাংলোর বারান্দায় বসে লিখচি। এখনি চা খেতে যাব।

তারপর আমরা রওনা হলুম। ডাঃ নেরুলকর স্টেশনে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ডুগ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যবর্ত্তী বিখ্যাত সালাকেসা ফরেস্ট দেখব বলে আমরা রাত দেড়টা পর্য্যন্ত জেগে বসে রইলাম। নাগপুর ছাড়িয়ে ছোট ছোট শালের জঙ্গল অনেক দেখা গেল—জ্যোৎস্না রাত্রে প্রাকণ্ড অরণ্যটার রূপ আমার মনে এমন এক গম্ভীর অনুভূতি জাগালে—সে রাত্রে ঘুম আমার আর

এল না—ডোঙ্গরগড় স্টেশনে গাড়ি এসে পড়ল, রাত তিনটে বেজে গেল, ঘুমুবার ইচ্ছেও হল না—জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিতে মন আর সরে না।

নাগপুর থেকে ফিরেই দেশে গিয়েছিলাম। ইছামতী দিয়ে নৌকোতে বিকেলের দিকে গ্রামের ঘাটে পেঁছুলাম। বাল্যে একটা কি ছেলেদের কাগজে একটা কবিতা পড়েছিলাম—

'ঘাটের বাটে লাগল যবে আমার ছোট তরী, ঘনিয়ে আসে ধরায় তখন শীতের বিভাবরী।'

এতকাল পরে সেই দুই চরণই বার বার মনে আসতে লাগল। মাধবপুরের মাঠে সূর্য্য অস্ত গেল, চালতেপোতার বাঁকের সবুজ ঝোপঝাপ দেখলাম—এবার কিন্তু চোখে লাগল না তেমন। কেন এমন হল কি জানি?

অবশ্য একথা ঠিক, এমন ঘন সবুজ ও নিবিড় বনসম্পদ C.P. অঞ্চলের নেই—সে হিসেবে বাংলাদেশের তুলনা হয় না ওসব দেশের সঙ্গে, কিন্তু ভূমিসংস্থান বিষয়ে বাংলা অতি দীন। জলকাদা, ডোবা, জলা, ugly জঙ্গল, এ বড় বেশী। লোকও ভূমিশ্রী বৰ্দ্ধিত করতে জানে না, নষ্ট করতে পারে। নানা কারণে বর্ষাকালে বাংলাদেশ আদৌ ভাল লাগে না। আবার খুব ঘন বর্ষায় খুব ভাল লাগে—যেমন শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিনগুলিতে যখন জলে থৈ-থৈ করে চারিধার। শেষ শরতের এসব বর্ষার সৌন্দর্য্য নেই, কিন্তু অসুবিধে ও শ্রীহীনতা যথেষ্ট। গাছপালায় মনকে বড় চাপা দিয়ে রাখে।

এবার কলকাতায় বড় ভাল লাগচে।

কাল সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েচি সারাদিন। সকালে বিশ্বনাথের মোটরে গোপালনগর গিয়েছিলাম—তারপর লাঙলচষার প্রতিযোগিতা হল, ছেলেদের দৌড় হল—তারপর বিকেলে বেলেডাঙ্গা গেলাম। সেখানে একটা ডাব খাওয়া গেল—স্কুলে যুগল শিক্ষক এল।

দেশ, খয়রামারির মাঠ এত ভাল লাগচে এবার! কাল হারাণ চাকলাদার মহাশয়ের ছেলের কৃষিক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম—মাঠের

মধ্যে ফুলের চাষ করেচে—বেশ দেখাচ্চে। একটা ঝাঁড়া গাছের কুঞ্জবন বড় সুন্দর। এবার জ্যোৎস্না খুব চমৎকার, শীতও বেশ। রোজ খয়রামারির মাঠে বেড়াই। আজ একা যাবো। একলা না গেলে কিছু হয় না।

রাজনগরের বটতলায় রোজ বেড়াতে যাই। সামনে অপরূপ রঙে রঙীন সূর্য্য অস্ত যায় দিগন্তের ওপারে, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ চারিদিক—মাটির সুঘ্রাণ স্মরণ করিয়ে দেয় ইসমাইলপুরের জনহীন চড়ায় এমন সব শীতের সন্ধ্যা, কত সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, কত কৃষ্ণা নিশীথিনীর শেষ যামের ভাঙা চাঁদের জনমানবহীন বনের পেছনে অস্ত যাওয়া, কত নীল পাহাড় ঘেরা দিকচক্রবাল, বিষম শীতের রাত্রে গনোরী তেওয়ারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শোনা অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বসে বসে।

সে সব দিনকাল কতদূরের হয়ে গেছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটাতে সকালে নীরদবাবুর সঙ্গে বহুকাল পরে বেলুড় গিয়েছিলাম। পেছনের ছাদটাতে বসে আবার পুরনো দিনের মত কত গল্প করলাম। পেছনের ছাদটা, বেলুড়ের বাড়ির চারিপাশের বাগান এত ভাল লাগল। ভেবেছিলাম এখানে আর আসা হবে না সেই বেলুড়ে আবার যখন আসা হল,—বিশেষ করে সেই শীতকালেই, যে শীতকালের রাত্রির সঙ্গে বেলুড়ে যাপিত কত রাত্রির সঙ্গে বেলুড়ে যাপিত কত রাত্রির মধুর স্মৃতির যোগ রয়েচে—তখন জীবনের অসীম সম্ভাব্যতার উপলব্ধি করে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাবাই মিলে আমরা চড়ুইভাতি করে খেলাম নীচের রান্নাঘরটাতে। পেঁপের ডাল হাতে রদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসলাম মালীর ঘরের সামনেই, নীচের ছাদটায় ফলসা গাছের ডালে সেই অপূর্ব্ব অবনমন দেখলাম, যা ওই ফলসা গাছটারই নিজস্ব, অন্য গাছের এ সৌন্দর্য্যভঙ্গি দেখি নি কখনো—বাগানের পাঁচিলের ওদিকে পাটের কলে নিবারণ সেই গোলপাতার ঘরখানা, শীতের দিনে গাঁদাফুল ফোটা নিকানো দুপাশে তক্‌তকে উঠোন,—সব যেন পুরাতন, পরিচিত বন্ধুর মতো আমাদের প্রাণে তাদের স্নেহস্পর্শ পাঠিয়ে দিলে, বড় ভাল লাগল

আজ বেলুড়।

সন্ধ্যায় আগেই মোটরে চলে এলাম কলকাতায়। কাল গিয়েছে পূর্ণিমা, আজ প্রতিপাদের চাঁদ রাত সাড়ে সাতটার পরে উঠল। ধোঁয়া নেই, এই যা সৌভাগ্য।

অনেক দিন পরে আজ আমড়াতলার গলির মুখে গিয়ে পড়েছিলাম—এতদিন চিনি নি—আজ চিনেচি।

এবার ইস্টারের ছুটিটা কাটাতে এলুম এখানে। সেবার এসে নীল ঝরনার যে উপত্যকা দেখে গিয়েছিলাম—আবার জ্যোৎস্না রাত্রে নিমফুল ও শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসের মধ্যে সে সব স্থান দেখলাম। রানীঝরনার পথে পাহাড়ে উঠে গোঁড় জাতির গ্রামে আবার বেরিয়ে এলাম। আজ বেড়িয়ে এলাম সকালে কাঁকড়গাছি ঘাট। সারা পথের দুধারে বন, তবে এখন শাল ও মহুয়া গাছ প্রায় নিষ্পত্র। তলায় সাদা সাদা মহুয়া ফুল টুপ টাপ ঝরে পড়চে। রাখামাইনস্ ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে বন ঘন, বড় বড় ছায়াতরুও আছে। কাঁকড়গছি ঘাটটা বড় চমৎকার, —এখানে একটা জায়গার চারিধারেই পাহাড়ের শ্রেণী। ছোট একটা ঝরনা আছে—তবে এখন ঝরনাতে জল খুবই কম। ওদিকে বনগাছের শোভা এদিকের চেয়ে সুন্দর। অপরাহ্নে বা জ্যোৎস্নারাত্রে এসব স্থানের শোভা অপূর্ব হবে সেটা বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। নীরদবাবুরা গরুর গাড়িতে এলেন—আমি দেখলাম ওর চেয়ে হেঁটে আসা অনেক বেশী আরামের। বাংলোর সামনে ছোট বাঁধটাতে স্নান করে এলাম। জল বেশ ভাল। খুব সম্ভব আজই রাত্রে কলকাতাতে ফিরব।

কাল রাখামাইনস্ থেকে বৈকালে হেঁটে আমরা তিনজন চলে এলাম শালবনের মধ্যে দিয়ে অস্তসূর্য্যের আলোয় রাঙানো সুবর্ণরেখা পার হয়ে। আজ সকালে গালুডির বাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। কাল রাতের চাঁদটা যে কখন কালাঝোর পাহাড় শ্রেণীর পিছন দিয়ে উঠল তা মোটেই টের পাই নি—স্টেশন থেকে এসে দেখি চাঁদ উঠে গিয়েচে। কিন্তু অনেক রাত্রে স্টেশনের পথের

ছোট ডুংরিটার সাদা সাদা কোয়ার্টজ পাথরের চাঁইগুলো, ছোট বটগাছটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আজ সকালে গুইরাম গাড়োয়ানের সঙ্গে দেখা, সে বললে ঠিকরী ও ধারাগিরির পথের জঙ্গলে খুব বন, বাঘের ভয়ও আছে। এবার আর যাওয়া হল না, পূজার সময় যাব।

এবার জীবনটা খুব গতিশীল হয়ে উঠেচে। এই তো গত শনিবারে রামনবমীর দোলের দিনও বারাকপুরে ছিলাম। দেখলাম আমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশ বনে কি রকম শুকনো পাতার রাশ পড়েচে, নদীর ধারে চটকাতলা খালের উঁচু পাড়ে কি রকম ঘেঁটুফুল ফুটেছে, রঘুদাসীদের বাড়িতে ওরা আবার এসেচে, পথে রঘুদাসীর সঙ্গে দেখা। তারপর খয়রামারির মাঠে সেই বেদেদের তাঁবুর ছোট গর্ত্তটা, সেখানে সেদিনও আকন্দ ফুলের শোভা দেখতে গিয়েচি— রাজনগরের বটতলাটা সন্ধ্যাবেলায় একা বেরিয়ে এসেচি আর ভেবেচি এসব জায়গা কত নিরাপদ, কত নিরীহ—হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে গালুডির বাংলোর পিছনে বসে লিখচি—রানিঝরনা নেকড়েডুংরি সব দেখা হয়েই গেছে। রাখামাইন্‌সে দুরাত্রি যাপন করে এলাম।

কিন্তু একটা দেখলাম ব্যাপার। এসব স্থানে সঙ্গী নিয়ে আসতে নেই। একা থাকলে নিজের মন নিয়ে থাকা যায়। তখন নানা অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত ভাব এসে মনে জোটে। কিন্তু সঙ্গীরা থাকলে তাদের মন আমাকে চালিত করে—আমার মন তখন আর সাড়া দেয় না, যেমন গভীর অতল তলে লাজুক তার মুখ লুকিয়ে থাকে। কাজেই সঙ্গীদের চিন্তা তখন হয় আমার চিন্তা—সঙ্গীদের ভাব তখন হয় আমার ভাব, আমার নিজস্ব জিনিস যেখানে কিছু থাকে না। কাল সুবর্ণরেখার পারের সূর্য্যাস্তের দৃশ্যটা, কিংবা গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় মহুলিয়ার প্রান্তরের ও নেকড়েডুরিং পাহাড়ের সে অবাস্তব সৌন্দর্য্য, একা থাকলে এসব দৃশ্যে আমার মন কত অদ্ভুত কথা বলত—কিন্তু কাল শুধু আড্ডা দেওয়াই এবং চা খাওয়াই হল—মন চাপা পড়ে রইল বটে, অর্থহীন প্রলাপ বকুনির তলায়, সম্মিলিত সিগারেট ধুমের কুয়াশায় আড়ালে।

তাই বলচি এসব স্থানে আসতে হয় একা। লোক নিয়ে আসতে নেই।

আজই এখান থেকে যাব। এখনি বলরাম সায়েরের ঘাটে নেয়ে আসবো—অনেকদিন পরে ওতে বড় আনন্দ পাব। দূরে কালাঝোর পাহাড়, চারিধারে তালের সারি, স্বচ্ছ শীতল জল—দীঘিটা আমার এত ভাল লাগে!

শালবনে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকচে কালাঝোর পাহাড়ের দিকে। এত ভাল লাগচে সকালটা!

খুড়োদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ি এসেছি। এবার গালুডিতে অনেকদিন থেকে আমার যেন নতুন চোখ খুলেচে, গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচূর্য্য এবার বেশী করে চোখে পড়েচে। সমস্ত প্রাণটা যেন একটা পার্ক—আমার বাড়িতে কোন গাছ থাকুক আর নাই থাকুক, সারা গ্রাম এমন কি কুঠির মাঠ, ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল বাঁশবন—এ সবই আমার। আমি দেখি, আমার ভাল লাগে—আমার না তো কার?

প্রায়ই বিকেল কুঠীর মাঠে বেড়াতে যাই, এবার একটা নতুন পথ খুলেচে মাঠের মধ্যে দিয়ে, সেটা আরও অপূর্ব্ব। এমন সবুজ মাঠে উলুফুল ফুটেচে চারিধারে, শিমুলগাছ হাত বেঁকিয়ে আছে, দূর বনান্তশীর্ষে বিরাটকায় Lyre পাখীর পুচ্ছের মতো বাঁশবনের মাথা দুলচে, এমন শ্যামলতা, এমন শ্রী—এ আমাদের এই দেশটা ছাড়া আর কোথাও নেই। দুপুরে আজ বেজায় গরম, কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি বলে অত গরমেও খুব ঘুমুলাম।

উঠে দেখি মেঘ করেচে। উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন নীল-কৃষ্ণ কালবৈশাখীর মেঘ,—তারপর উঠল বেজায় ঝড়। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না, একখানা গামছা নিয়ে তখনি নদীর ঘাটে চলে গেলাম! পথে জেলি বললে শিগগির নেকো তলায় যান, ভয়ানক আম পড়চে। কিন্তু আজ আর আম কুড়োবার দিকে আমার খেয়াল নেই। আমি নদীর ধারে কালবৈশাখীর লীলা দেখতে

চাই। নদীজলে নামবার আগেই বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল—জলে নেমে দেখি জল গরম, যেন ফুটচে। এপার ওপার সাঁতার দিতে লাগলাম। কালো জলে ঢেউ উঠেচে, মুখে নাকে মাথার ঢেউ ভেঙে পড়চে, ওপারে চরের ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, বন্যেবুড়ো গাছ ঝড়ে উল্টে উল্টে যাচ্চে, বৃষ্টির ধোঁয়ায় চারিধার অন্ধকার হয়ে গেল, নদীজলের অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ বেরুচ্চে, দূর দূর সমুদ্রের কথা মনে হচ্ছে। এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ন ও নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা—প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে মিশে হাত-ধরাধরি করে চলা—ঐ শ্যামল-ডালপালাওঠা শিমুলগাছ, সাঁইবাবলা গাছ—এই তো আমি চাই। এদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করব ঐ ঝোড়ো মেঘে আমার ভগবানের উপাসনা, ঐ তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুতে, এই কালো নদীজলের ঢেউয়ে, ঝড়ের গন্ধে, বাতাসের গন্ধে, বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধে, চরের ঘাসের কাঁচা গন্ধে—।

কাল কুঠীর মাঠে বসে এই সব কথা ভাবছিলাম। তারপর নদীজলে নাইতে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব মনে এল। সমস্ত দেহ মন যেন আপনা-আপনি নুয়ে পড়তে চাইল। এ ধরনের ভক্তি একটা বড় bliss, জীবনে হঠাৎ আসে না। যখন আসে, তখন বিরাট রূপেই আসে, আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে তীরে। এ Realisation যেমন দুর্ল্লভ, তেমনি অপূর্ব্ব।

আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তাঁর এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।

এবার মোটে বৃষ্টি নেই—পথঘাট এখনও শুকনো খটখটে, অন্য-বার এমন সময় খানা ডোবা জলে ভরে যায়, কুঠীর মাঠের রাস্তায় কাদা হয়। তবে এবার সোঁদালি ফুল যেন কমে আসছে, বেল ফুলের গন্ধেরও তেমনও জোর নেই।

কাল বিকেলে পাঁচি এসেচে। সে, আমি, খুকু, রাণু মায় ন'দি ক'জনে কাল বসে কালিদাসের মেঘদূত ও কুমার-সম্ভবের চর্চ্চা করেচি। বিকেলে আমি কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ঘাটে স্নান

করতে এসে দেখি ওরা সবাই ঘাটে—খুকু ও রাণু সাঁতার দিয়ে গিয়েচে, প্রায় বাঁধালের কাছে। আমি স্নান সেরে উঠে আসচি, কালো তখন গেল শিমুলতলাটার কাছে। আমি বললুম, তোর মা ঘাটে তোকে ডাকচে। সে 'যাই' বলে একটা বিকট চিৎকার করে চলে গেল। একটু পরে দেখি খুকু আমার ডাকচে। বাঁশবন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেচে—ও ঘাট থেকে আসবার সময় বোধ হয় অন্ধকার দেখে ভয় পেয়েচে। আমি দাঁড়িয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।

আজ ওবেলা স্নানের সময়ে মনে কি যে এক অপূর্ব্ব ভাব এসেছিল! প্রতিদিনের জীবন এই মুক্তরূপা প্রকৃতির মধ্যে সার্থক হয় এখানে—এইসব ভাবে ও চিন্তার ঐশ্বর্য্যে।

আজ অনেক কাল পরে ন'দির কাছ থেকে গৌরীর হাতের লেখা একখানা গানের খাতা পেয়েচি। এতদিন কোথায় এখানা পড়ে ছিল, বা কি করে ন'দির হাতে এল—তার কোন খবর এরা দিতে পারলে না। Appropriately enough, খাতায় প্রথম গানটিই হচ্চে –

ঐ নীল উজ্জ্বল তারাটি
করুণ, অরুণ তরুণ অমিয় মাখান হাসিটি
বহুদূর জগতে গিয়েচে গো চলি প্রণয়বৃন্ত ছিঁড়িয়া
ভালবাসা সব ভুলে গেছে ··

চোদ্দ-পনেরো বছর আগের এমনিধারা কত উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত প্রভাত, বর্ষার কত মেঘমেদুর সন্ধ্যার কথা মনে আনে। ··

যাক। কাল আকাশে হঠাৎ বৃশ্চিক নক্ষত্র দেখেচি—একে প্রথম চিনি বেলপাহাড়ের স্টেশনে—পরিমল আমাকে চিনিয়ে দেয়—আমি ওটা চিনতাম না। কাল দেখি শ্যামচরণ-দাদাদের বাঁশঝাড়ের মাথায় ওপর বিরাট ওর অগ্নিপুচ্ছটা বেঁকে আছে। আকাশের ওদিকটা আলো হয়ে উঠেচে খুকুকে বললুম, ঐ ছ্যাখ বৃশ্চিক নক্ষত্র—

তাকে চিনিয়ে দিলুম। রাণু জিজ্ঞেস করলে—তবে তার বয়েস যদিও খুকুর চেয়ে অনেক বেশি, সে অত বুদ্ধিমতী নয়—পনেরো

মিনিট কঠিন পরিশ্রমের পরে তাকে বোঝাতে পারলুম কোনটাকে আমি বৃশ্চিক রাশি বলতে চাচ্চি।

এদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ঢলে পড়চে ক্রমেই মেজো খুড়ীমাদের রান্না ঘরের ওপর। রাত অনেক হল, ওরা তবুও তাস খেলবেই। বেগতিক দেখে বললুম, আলোতে তেল নেই।

নইলে ঘুম হবার জো নেই, ওদের খেলার গোলমালে।

লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম, রাত তখন বারোটার কম নয়।

বিকেলে কালো আর আমি মোল্লাহাটির পথে বেড়াতে গেলাম। আজ দুপুরে যখন এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাই, তখনই খুব মেঘ করেছিল—একটু পরে সেই যে বৃষ্টি এল, আর রোদ ওঠে নি। মেঘ ভরা বিকেল শ্যামল মাঠ ও দূরের বাঁশ বন, বড় বড় বটগাছ, এক রকম কি গাছ আছে, মখমলের মত নরম সবুজ পাতা ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে ঝোপের সৃষ্টি করে—এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মোল্লাহাটি ও পাঁচপোতা বামুনডাঙ্গার পথের মোড়ে গিয়ে একখানা ছই-চাপা গরুর গাড়ির সঙ্গে দেখা হল। তাদের গাড়োয়ানা জিগ্যেস করলে, বাবুর কাছে কি বিড়ি আছে?

—না নেই। বিড়ি খাই নে—

—আপনারা কোথায় যাবেন?

—কোথাও যাব না, এই পথে একটু বেড়াচ্চি।

ফিরবার পথে মনে হল কলকাতায় থাকবার সময় যখন গাছপালার জন্যে মনটা হাঁপায়, তখন যে কোনো ছবি, একটা বনের ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয়, ওঃ কি বনই এদেশে! প্রায়ই বিদেশের ফটো—আফ্রিকার, কি দক্ষিণ আমেরিকার—কিন্তু তখন ভুলে যাই যে আমাদের গ্রামের চারিপাশে সত্যিকার বন জঙ্গল আছে অতি অপূর্ব্ব ধরনের—যখন বিলিতি **Grand Evening Annual** দেখি তখন ভুলে যাই কত ধরনের অদ্ভুত গাছ আছে আমাদের বনে জঙ্গলে—যা বাগানে, পার্কে নিয়ে রোপণ করলে অতি সুদৃশ্য কুঞ্জবন সৃষ্টি করে—

যেমন খাঁড়া, কুঁচলতা, ঐ নাম-না-জানা গাছটা—এরা যে-কোন বিখ্যাত পার্কের সৌন্দর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে।

সেদিন যখন আমি, রাণু, খুড়ীমা, ন'দি নদীতে বিকেলে স্নান করচি তখন একটা অদ্ভুত ধরনের সিঁদুরে মেঘ করলে—ওপারের খড়ের মাঠের উলুবনের মাথা, শিমুলগাছের ডগা, যেন অবাস্তব, অদ্ভুত দেখাল, যেন মনে হচ্ছিল ওখান থেকেই নীল আকাশটার শুরু।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় একা নদীতে নেমে যে অপূর্ব্ব অনুভূতি হয়েছিল যা বোধ হয় জীবনে আর কোনদিন হয় নি। শিমুলগাছের মাথায় একটা তারা উঠেছে—দূরে কোথায় একটা ডাহুক পাখী অবিশ্রান্ত ডাকচে। মাধবপুরের চরের দিকে ভায়োলেট রঙের মেঘ করচে—শান্ত, স্তব্ধ নদীজলে তার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব।

মানুষ চায় এই প্রকৃতির পটভূমির সন্ধান। এতদিন যেন আমার Emerson-এর মতের সঙ্গে খুব মিল ছিল। সেদিনও বঙ্গশ্রী আপিসে কত তর্ক করেচি, আজ একটু মনে সন্দেহও জেগেচে! মানুষ এই সৃষ্টিকে মধুরতর করেচে। ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম যদি না থাকে, তবে ওর সার্থকতা কিছুই নয়। হৃদয়ের ধর্ম্ম সব ধর্ম্মের চেয়ে বড়।

আজ সকাল থেকে বর্ষা নেমেচে। ঝিম্-ঝিম্ বাদলা, আকাশ অন্ধকার। আজ এই মেঘমেদুর সকালে একবার নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করচে—বাঁওড়ের ধারের বেলে মাটির পথ বেয়ে একেবারে কুঁদীপুরের বাঁওড় বাঁয়ে রেখে মোল্লাহাটির খেয়া পার হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্চে পিসিমার বাড়ি পাটশিমলে বাগান-গাঁ। কাল সুন্দরপুর পর্য্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলুম বৈকালে ও পথের প্রাচীন বটগাছের সারির দৃশ্য আমি আবাল্য দেখে আসচি, কিন্তু পুরনো হল না—যত দেখি ততই নতুন। গাছে গাছে খেজুর পেকেচে, কেঁয়োঝাঁকা গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা গজিয়েচে এই বর্ষায়। আরামডাঙ্গার মাঠে মরগাঙের ওপারে, সবুজ আউশ ধানের ক্ষেত

এবং গ্রামসীমায় বাঁশবনের সারি মেঘমেদুর আকাশের পটভূমিতে দেখতে হয়েচে যেন কোন বড় শিল্পীর হাতে-আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ। ক্ষেত্রকলু ওদিক থেকে ফিরচে, হাতে ভাঙা লণ্ঠন একটা। বললে মোল্লাহাটির হাটে পটল কিনতে গিয়েছিল।

—পটল না কিনেই ফির্‌লে যে?

—কি করব বাবু, দু'পয়সা সের দর। একটা পয়সাও লাভ থাকচে না। গোপালনগরের হাটেও ওই দর। এবার তাতে আবার পটল জন্মায় নি! যে দুব'চ্ছর পড়েচে বাবু!

কলকাতাটা যেন ভুলে গিয়েচি। যেন চিরকাল এই বটের সারি, বাঁওড়, সুন্দরপুর, সখীচরণের মুদীখানার দোকানে কাটাচ্চি জীবনটা। এদের শান্ত সঙ্গ আমার জীবনে আনন্দ এনেচে উগ্র দুরাশার মত্ততা ঘুচিয়ে। সে দুরাশাটা কি? নাই বা লিখলাম সেটা।

আজ বিকেলে সারা ঈশান কোণ জুড়ে কালবৈশাখীর মেঘ করল এবং ভয়ানক ঝড় উঠল। হাজারী জেলেনী, জগবন্ধু, কালো, জেলি ওরা আম কুড়ুতে গেল বাগানে—কারণ এখনও আম যথেষ্ট আছে, ঝিনুকে গাছ, চারাবাগানে, মাঠের চারায়।

তারপর ঘন বর্ষা নামলো—আমি আর কালো বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বর্ষাস্নাত গাছপালা, বটের সারি, উলুর মাঠের মধ্য দিয়ে বেলেডাঙ্গাতে। সেখান থেকে যখন ফিরি, বর্ষা আরও বেশি, বিদ্যুতের এক একটা শিখা দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী—আকাশে কালো কালো মেঘ উড়ে চলেছে—আমার মনে হল আমিও যেন ওদের সঙ্গে চলেচি মহাব্যোম পার হয়ে চিন্তাতীত কোন্ সুদূর বিশ্বে—আকাশ মহাকাশে আমার সে গতি—পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন, সুখদুঃখ ঘরগৃহস্থালীর বন্ধনমুক্ত আমার আত্মা, সে পায়ের তলায় সারা পৃথিবীর মোহ মাড়িয়ে চলেচে—মহাব্যোমের অন্ধকার, শূন্য, মেঘ, ইথার, সমুদ্র ভেদ করে মুক্তপক্ষ গতিতে অমিত-তেজে চলেচে—দিক্‌পাল বৈশ্রবণের বিশ্রবিদ্রাবণকারী পৌরুষের বীর্য্যে।

নদীতে স্নান করতে নেমে সাঁতার দিয়ে বৃষ্টি মাথায় চলে গেলুম

ওপারে মাধবপুরের চরের ওপর বর্ষা দেখতে—পশ্চিম দিকে পিঙ্গল বর্ণের মেঘ হয়েচে, ওপারের বাঁশবন হাওয়ায় দুলচে—তারপর আমরা আবার এপারে এলাম—ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি এলাম।

আজকাল সন্ধ্যাটি ঠিক বর্ষাসন্ধ্যা—কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে মনে হচ্চে। যেন আর কেউ থাকলে ভাল হত—কত থাকলেই তো ভাল হত—সব সময় হয় কৈ?

আমার মনে এই যে অনুভূতি—এ অনেক কাল পরে আবার হল। আমি কত নিঃসঙ্গ নির্জ্জন জীবন যাপন করেচি কতকাল ধরে, লোকালয় থেকে কতদূরে। কিন্তু ১৯২৩—২৬ সালের পরে ঠিক এ ধরনের বেদনা-মাখানো নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আর কখনো হয় নি। এই মনের অবস্থা আমি জানি, চিনি একে—এ আমার পুরাতন ও পরিচিত মনোভাব, কিন্তু ১৯২৬ সালের পরে ভুলে গিয়েছিলাম একে—আবার সেই ফিরে এল।

কাল আবার খুব আনন্দ পেয়েচি। মনের ও ভাবটা কাল আর ছিল না। বিকেলে আমরা কাঁচিকাটার পুলের পথে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলাম। নীল মেঘে সারা আকাশ জুড়ে ছিল—কাল স্নান করে ফিরবার পথে শিমূল গাছটার ওদিকে আউশ ধানের ক্ষেতের ওপরকার নীল আকাশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—অমনি মনের ভাব বিকেলেও হয়েছিল। আরামডাঙ্গার ওপারে সেই খাবরাপোতার দিকের আকাশে একটা নীল পিঙ্গল বর্ণশ্রী, সূর্য্য বোধহয় অস্ত যাচ্ছিল, আমরা কিন্তু পেয়ারা গাছটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না—আমি আর কালো কত খুঁজলাম, আরামডাঙ্গার পথে মরগাঙের ধারে সেই পেয়ারা গাছ যে কোথায় গেল!

সন্ধ্যার কিছু আগে কুঠীর মাঠে একটা ঝোপেঘেরা নতুন জায়গা আবিষ্কার করা গেল—এদিকটায় কখনো আসি নি—এমন নিভৃত স্থানটা, খুব আনন্দে নদীতে সাঁতার দিলাম।

এবার বারাকপুরে চমৎকার ছুটিটা কাটল। সমস্ত ছুটিটাই তো এখানে রয়েচি। আর বছর এখানে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলাম—

বনগাঁয়ে ছিলাম বেশীদিন। এবার এখান থেকে কোথাও যাই নি। এখান থেকে যেতে মনও নেই। কলকাতার জীবনটা যেন ভুলে যেতে বসেচি।

কাল বিকেলে ঘন কালো মেঘ করে বৃষ্টি এল। আমি আর কালো বৃষ্টিমাথায় বেলেডাঙ্গার পুল পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলাম। ঝোপ-ঝাপ ভিজে কেমন হয়ে গিয়েচে—গাছপালার গুঁড়ির রং কালো—ডালপাতা থেকে জল ঝরে পড়ার শব্দ। তারপরে নদীর জলে স্নান করতে নামলাম—সাঁতার দিয়ে বাঁধাল পর্য্যন্ত গেলাম।

সাঁতার দিয়ে এত আনন্দ পাই নি কোনদিন এবারকার গরমের ছুটির আগে। কুঠীর মাঠের একটা নিভৃত স্থানে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—মাথার ওপর কালো মেঘ উড়ে যাচ্চে—দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের শিখা—শুধু চারিদিকে বৃষ্টির শব্দ—গাছের পাতায়, ডালপালায় ঝোড়ো হাওয়া বইচে—নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকার সে অনুভূতির তুলনা হয় না। তার প্রকাশের ভাষাও নেই—যা খুব ঘনিষ্ঠ, খুব আপন, তাকে কি আর প্রকাশ করা যায়?

আজ বিকেলে বহুদিন পরে ভারী সুন্দর রাঙা রোদ উঠল। বাঁধালের কাছে নাইতে নেমে মাঝ-জলে গিয়ে ওপারের একটা সাঁইবাবলা গাছের ওপর রোদের খেলা দেখছিলাম—কি অদ্ভুত ধরনের ইন্দ্রনীল রং-এর আকাশ, আর কি অপূর্ব্ব সোনার রং রোদের।··· সকলের চেয়ে সেই সাঁইবাবলা গাছের বাঁকা ডালপালা ও ক্ষুদে ক্ষুদে সবুজ পাতার ওপর সোনার রংয়ের রোদের খেলা।···তারই পাশে ওপারের কদম্বগাছটাতে বড় বড় কুঁড়ি দেখা দিয়েচে··শ্রাবণের প্রথমেই ফুল্লপুষ্পসম্ভারে নতশাখ-নীপতরুটি বর্ষাদিনের প্রতীক্ স্বরূপ ওই সবুজ উলুখড়ের মাঠে স্বমহিমায় বিরাজ করবে—বর্ষার ঢল নেমে ইছামতী বেড়ে ওর মূল পর্য্যন্ত উঠবে, ঝরা কেশররাজি ঘোলাজলের খরস্রোতে ভেসে চলে যাবে···উলুবন আরও বাড়বে···আমি তখন

থাকবো কলকাতায়, সে দৃশ্য দেখতে আসবো না।

কাল সকালে এখান থেকে যাবো, আজই এখানে থাকার শেষ দিন এ বছরের মতো। এবার ছুটিটা কাটল বেশ—কি প্রকৃতির দিক থেকে, কি মানুষের দিক থেকে, অদ্ভুত ভাবে ছুটিটা উপভোগ করা গেল এবার। কলকাতায় থাকলে আমার যে আফ্রিকা দেখবার ইচ্ছে হয়, পাহাড় জঙ্গল দেখবার ইচ্ছে হয়—এখানে দীর্ঘদিন কাটালে কিন্তু আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। গাছপালায়, নীল আকাশে, নদীর কালোজলে সাঁতার দিতে দিতে ত্ব'পাশের বাঁশবন, সাঁইবাবলার সারি চেয়ে চেয়ে দেখা, সবুজ উলুর মাঠের দৃশ্য, পাখীর অবিশ্রান্ত ডাক—এখানে মনের সব ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়। বসে লিখচি, রাণু এসে বললে—দাদা, এক কাপ চা খাবেন কি? সে ওদের রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে এসেচে বয়ে। আর কাল থেকে অনবরত বলচে—দাদা চলে যাবেন না কাল, আর একদিন থাকুন, আপনি চলে গেলে পাড়া আঁধার হয়ে যাবে।

কাল সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিন চার বার একথা বলেচে—অথচ ওর ওপর কি অবিচার করেচি এবার—ওকে নিয়ে তাস খেলি-নি একটি দিনও—ও খেলতে চাইলেও খেলি নি। ভাল করে কথাও বলি নি।

বললে—জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আসবেন তো?

আমি বললাম—যদিই বা আসি, তোর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। তুই তার আগেই তো চলে যাবি।

এদের কথা ভেবে কলকাতায় প্রথম প্রথম কষ্ট হবে।

পূজার ছুটিতে বাড়ি এসেচি। রাখামাইনস্ গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন একা মেঘান্ধকার বিকালবেলাতে সাটকিটার অরণ্যময় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিলাম। এই পথে একা যেতে ওদেশের লোকও বড় একটা সাহস করে না।—যখন একটা ছোট

পাহাড়ী ঝরনায় নেমে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা অংশ সেখানে রেখে দিচ্চি, কাল নীরদবাবুদের বিশ্বাস করাবার জন্যে, তখন সেখানে কুলুকুলু ঝরনার শব্দটি মেঘশীতল বৈকালের ছায়ায় কি সুন্দর লাগছিল! পাহাড়ের Saddleটা যখন পার হচ্চি তখন ঝম-ঝম করে বৃষ্টি নামল, হাজার হাজার বনস্পতির পাতা থেকে পাতায় ঝর্‌-ঝর্‌ করে বৃষ্টি পড়ছিল। দূরের কালাঝোর পাহাড় মেঘের ছায়ায় নীল হয়ে উঠেচে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করচে। কালিদাসের 'সানুমান আম্রকুট' কথাটি বার বার মনে পড়ছিল—একা সেই মহুয়াতলায় শিলাখণ্ডে বসে।

একদিন রাখামাইন্‌স্‌-এর বাংলোর পেছনে বনতুলসীর জঙ্গলে ভরা পাহাড়টার মাথায় অস্তগামী সূর্যের আলোতে বসেছিলাম, ওদিকে রাঙা রোদ-মাখানো সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথাটা দেখা যাচ্ছে, এদিকে পাহাড়ের Ledge থেকে দূরে গালুডির চারুবাবুর বাংলো দেখা যাচ্চে —সেদিন কি আনন্দ যে মনে এল—তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না। সেদিন আবার বিজয়া দশমী—নীল ঝর্ণার ধারে একটা শিলা-খণ্ডে একা বসে রইলাম সন্ধ্যাবেলাতে, ক্রমে জ্যোৎস্না উঠল, মহুয়াতলার ঘাট দিয়ে পাহাড়ের দিক দিয়ে ঘুরে আসতে আসতে কুসুমবনীতে উড়িয়া মুদীর দোকানে গেলাম সিগারেট কিনতে। আশ্চর্য্যের বিষয় এইখানে হঠাৎ নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী Shanger সাহেব বাংলো থেকে চা খেয়ে ঐ পথে মেঘ-ঢাকা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন—বিজয়ার কোলাকুলি সেই দোকানেই সম্পন্ন হল। ভাবলাম, আজ আমাদের দেশে বাঁওড়ের ধারে বিজয়া দশমীর মেলা বসেচে।

তার পরদিন আমরা গালুডিতে গেলাম ডোঙাতে সুবর্ণরেখা পার হয়ে—চারুবাবুদের বাংলোতে গিয়ে সুরেনবাবু, আমি নেকড়েডুংরি পাহাড়ে গিয়ে উঠে বসলাম। চা খেয়ে আশাদের বাড়ি গিয়ে গান শুনলাম আশার—সেখানে বিজয়ার মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লে না।

ফিরবার পথে সুবর্ণরেখাতে ডোঙা পাওয়া গেল না—অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না-রাত্রে সুবর্ণরেখা রেলের পুল দিয়ে চন্দ্ররেখা গ্রামের মধ্যে দিয়ে অনেক রাত্রে ফিরলাম রাখামাইন্‌সের বাংলোতে। নদী পার হবার সময়ে সেই ছবিটা · সেই নদীর ওপরে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখা যাচ্চে, নীচে শিলাস্তৃত সুবর্ণরেখা, পশ্চিম তীরে ঘন শাল জঙ্গল, দূরে শ্যামপুর থানার ক্ষীণ আলো, লাইনের বামদিকের গাছগুলো আধ জ্যোৎস্নায় আধ অন্ধকারে দেখা যাচ্চে না, কিন্তু ফুটন্ত ছাতিম ফুলের ঘন সুগন্ধ; বাংলোতে ফিরে এসে দেখি—প্রমোদবাবু এসে বসে আছেন।

পরদিন আমরা সবাই মিলে নাটকিটার জঙ্গলের পথে গেলাম—তার পর দিন গালুডি থেকে চারুবাবু, সুরেনবাবু ও মেয়েরা এলেন। চার নম্বর খাদানের নীচের জঙ্গলের মধ্যে পিক্‌নিক্ হল। ঝুনু, আশা, আমি, চারুবাবু, সুরেনবাবু ও ভিক্টোরিয়া দত্ত বলে একটি মেয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আরোহন করলাম। একেবারে-সিদ্ধেশ্বরের মাথায়। একটা অম্লমধুর বনফুলের কাঁচা ডাল ভেঙে নিয়ে পাহাড়ে উঠলাম—তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।

সেদিন আমি স্টেশনের বাইরে কি একটা গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর বসে রইলাম যেমন সেদিন সকালে আমি ও গ্রামের প্রমোদবাবু পিয়ালতলার ছায়ায় প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে শুয়ে বটগাছটার দিকে চেয়ে প্রভাতী আলোতে অজানা কত কি পাখীর গান শুনছিলাম।···

বেলা পড়ে এসেছে বারাকপুরে বসে এইসব কথা লিখতে লিখতে মন আবার ছুটে চলে যাচ্ছে সেই সব দেশে। শীতের বেলা এত তাড়াতাড়ি রোদ রাঙা হয়ে গাছের মাথায় উঠে গেল! বকুলগাছের মাথায়, বাঁশগাছের মাথায় উঠে গিয়েচে রোদ একেবারে।

সেই সুন্দর লতাপাতার গন্ধটা এবার ভরপুর পাচ্চি—ঠিক এই সময়ে ওটা পাওয়া যায়। কাল এখানে চড়কতলায় কৃষ্ণযাত্রা হল, জ্যোৎস্নারাত্রে গাছপালায় শিশির টুপটাপ ঝরে পড়চে—আমি চালতে-তলার পথে একা শুধু বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। কি রূপ দেখলাম

কাল জ্যোৎস্নাভরা রহস্যময়ী হেমন্ত রাত্রির! কাল নদীর ধারে বিকেলেও অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

কাল বিকেলে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে পাটলবর্ণের মেঘস্তূপের দিকে চোখ রেখে একটা জলার ধারে বসলাম—গাছপালার কি রূপ! সেই যে গন্ধটা এই সময় ছাড়া অন্য সময় পাওয়া যায় না—সেই গন্ধ দিন রাত সকাল সন্ধ্যা আমাকে যেন অভিভূত করে রেখেচে।

আজ কদিন বর্ষা পড়েচে—বসে বসে আর কোন কাজ নেই, খুকুদের সঙ্গে গল্প করচি, কাল সারাদিনই এইভাবে কেটেচে, তবুও কাল নদীতে এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিলাম, একটু ব্যায়ামের জন্যে। আজ সকালে নদীর ঘাটে ভোরবেলা গিয়ে মেঘমেদুর আকাশের শোভায় আনন্দ পেলাম। এই শিমূলগাছগুলো আমাদের এদেশের নদীচরের প্রধান সম্পদ! এগুলো আর সাঁই-বাবলা না থাকলে ইছামতীর তটশোভা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হত।

আজ সকালে নদীর ঘাটে গিয়ে চারিদিকের আকাশে চেয়ে দেখলাম মেঘ অনেকটা কেটেছে আকাশের নীচে একটু একটু আলো দেখা যাচ্চে—বোধ হয় ওবেলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনটা তপ্ত নির্ম্মল আকাশ ও প্রচুর সূর্য্যালোকের জন্যে হাঁপাচ্চে—কাকাদের শিউলি গাছটার দিকে চেয়ে দেখচি গাছপালার স্বাভাবিক প্রভাতী রং ফিরে এসেচে—সে ঘষা কাচের মত রং নেই আকাশের। কিন্তু একটু পরেই ঘন মেঘে সব ঢেকে দিলে।

আমি আবিষ্কার করেচি আমাদের দেশের প্রথম হেমন্তের সে অপূর্ব্ব সুগন্ধটা প্রস্ফুটিত মরচে-লতার ফুলের গন্ধ। হঠাৎ কাল বিকেলে আমি এটা আবিষ্কার করেচি। কুঠীর মাঠে আজ স্নানের পূর্ব্বে বেড়াতে গিয়ে বনে বনে খানিকটা বেড়ালাম, লক্ষ্য করে দেখলাম এই সময়ে কত কি বনের লতাপাতায় ফুল ফোটে। মরচে-লতা তো পুষ্পিত হয়েছেই, তা ছাড়া মাখমসিমের গোলাপী ফুলের দল ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে, কেঁয়োঝাঁকার লতায় ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল ফুটেচে, ফুল বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন হলদে পুষ্পরেণু—কি

ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ, ডালের গায়ে পর্য্যন্ত ফুল ফুটেছে। ছাতিম ফুলের এই সময়, কুঠীর মাঠের জঙ্গলে একটা নবীন সপ্তবর্ণ তরুর দেখা মিলল, কিন্তু ফুল হয় নি তাতে। মেটে আলু তুলবার বড় বড় গর্ত্ত বনের মধ্যে, এক জায়গায় একটা খুব বড় কেঁয়োঝাঁকার ঝোপকে কেটে ফেলেচে দেখে আমার রাগ ও দুঃখ দুই-ই হ'ল, নিশ্চয় যারা মেটে আলু তুলতে এসেছিল, তাদেরই এই কাজ। সজীব পুষ্পিত গাছ—কারণ এই সময় কেঁয়োঝাঁকার ফুল হয়—কেটে ফেলা যে কতদূর হৃদয়হীন বর্ব্বরতা, তা আমাদের দেশের লোকের বুঝতে অনেকদিন যাবে। সেবার অমনি যুগল কাকাদের বাড়ির সামনের কদমগাছটা কালো বিক্রী করে ফেললে তিন টাকায়, জ্বালানি কাঠের জন্যে। এমনি কি কেউ কোথাও শুনেচে? কদমগাছ, যা গ্রামের একটা সম্পদ, যে পুষ্পিত নীপ সকল বৈষ্ণব কবিকুলের আশ্রয় ও উপজীব্য—সামান্য তিনটে টাকার জন্যে সে গাছ কেউ বেচে? শুধু আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হয়, সুন্দরকে দেখবার চোখ থাকলে, ভালবাসার প্রাণ থাকলে এসব কি আর হত?

কাল বিকেলে অল্পক্ষণের জন্য সোনালী রাঙা রোদ উঠল—বেলেডাঙ্গার পথে যেখানে একটা বাবলা গাছের মাথায় একটা বুনো চালকুমড়ো হয়ে আছে, ঐখানটাতে বসলুম—কত দিনের মেঘমেদুর আকাশের পরে আজ রোদ উঠেচে, এ যেন পরম প্রার্থিত ধন!

এক জায়গায় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকতে দেখলাম মাঠের মধ্যে। কার্ত্তিক মাসে সোঁদালি ফুল কল্পনা করতেই পারা যায় না। কেলে-কোঁড়ার ফুলও এসময়ে হয়।

কাল মেয়েরা চোদ্দ শাক তুললে, চোদ্দ পিদিম দিলে—খুকুদের বোধনতলায় বড় একটা প্রদীপ দিয়েছিল, বিলবিলের ধারে, উঠোনের শিউলিতলায়। বারাকপুরে চোদ্দ পিদিম দেওয়া দেখি নি কতকাল!

আজ বিকেলে খুকুদের কুঠীর মাঠে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। পুরনো কুঠীর হাউজঘরে ঘোর জঙ্গল হয়েচে—কত কি বনের লতা হয়ে আছে

—খুকুর তা দেখে আনন্দ উৎসাহ দেখে কে! একটা লতার মধ্যে কি ভাবে ঢুকে সে খানিকটা দুললে, মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করলে—আমায় কেবল চেঁচিয়ে বলে—দাদা, এটা দেখুন, ওটা দেখুন। তারপর ফিরে এসে ছেলেদের নিয়ে গোপালনগরে গেলাম কালী পুজোর ঠাকুর দেখাতে। হাজারীর ওখানে অনেক রাত হয়ে গেল তাস খেলতে বসে—অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

পরদিনও আবার কুঠীর মাঠে যাওয়ার কথা ছিল—ওরা সবাই গেল, কিন্তু মনোরমার ভাই কালো কুঠীর জঙ্গলে হাঁটুটা বেজায় কেটে ফেললে, তার ফলে সকলেরই বেড়ান বন্ধ হল। রাত্রে খুকুকে অনেক গল্প শোনালাম অনেক রাত পর্য্যন্ত।

আজ সকালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। রায়বাড়ির পাঁচি কাঁদচে, ওর দাদা আশু মাসখানেক হল মারা গিয়েচে, সেই জন্যে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের ধরনে 'ও ভাই রে, বাড়ি এসো', বলে চেঁচিয়ে কাঁদচে। কিন্তু আমার মনে সত্যিই দুঃখ হল ওর জন্যে। পাঁচিকে এ গাঁয়ের সব লোকেই 'দূর, ছাই' করে সবাই ঘেন্না করে—আজ পাঁচি ওদের সবারই বড় হয়ে গিয়েচে। তবুও তার প্রতি সহানুভূতি নেই কারুর—কান্না শুনে পিসিমা বলচেন, মুখ বেঁকিয়ে—'আহা! মনে পড়েচে বুঝি ভাইকে।'

নৌকো করে বনগাঁয়ে যাচ্চি সকালবেলা। চাল্‌কীর ঘাটে এসেচি - এবার এদিকের পাড় ভেঙেচে। কেমন নীল রং-এর একটি পাখী বাবলা গাছে শিস্ দিচ্চে। নৌকোর দুলুনিতে লেখার বড় ব্যাঘাত হচ্চে। নীল কলমীর ফুল, হলদে বড় বড় বন-ধুঁধুলের ফুল ফুটেচে। আর এক রকম কি লতায় কুচো কুচো হলদে ফুল ফুটে চালতেপোতার বাঁকে ঝোপের মাঝে আলো করে রেখেচে—সে যে কি অপূর্ব্ব সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! এই ফুলের নাম জানি নে, যেন হলদে নক্ষত্র ফুটে আছে—ছোট ছোট ক্ষুদে ক্ষুদে, যেন নববধূর নাকছাবি। কার্ত্তিকের শেষে এই ফুলটা ফোটে জেনে

রাখলাম, আবার আসচে বছর দেখতে আসবো। এতদিন এ ফুল আমার চোখে পড়ে নি। হেমন্তে এত বনের-ফুলও ফোটে এদেশে! ঝোপের মাথা আলো করে সবুজ পাতালতার মধ্যে তিৎপল্লার ফল, ক্ষুদে ক্ষুদে ঐ অজানা ফুল, মাঝে মাঝে বড় বড় বনকলমীর ফুল—কি রূপ ফুটেচে প্রভাতের। কাশফুল তো আছেই মাঝে মাঝে, নদী-তীরের কি অপূর্ব্ব শোভা এখন—তা ছাড়া পুষ্পিত সপ্তপর্ণও মাঝে মাঝে যথেষ্ট।

ঐ অজানা ফুলটা মাঝিকে দিয়ে ঝোপ থেকে পাড়িয়ে আনলাম—দশটি করে ছোট ছোট পাপড়ি—ছ'টা করে পরাগ কোষ বা গর্ভকেশর প্রত্যেকটাতে। জলে কচুরীপানার ফুল ফুটেচে, অনেকটা, কাঞ্চন ফুলের রং, কিন্তু দেখতে বড় চমৎকার—একটা লম্বা সরস সবুজ ডাঁটায় থোকা থোকা অনেকগুলো ফুল—ঐ সুন্দর ফুলের জন্যেই কচুরীপানা সৃষ্টির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে—ভগবানের কাছে সুন্দরের সার্থকতা অমর—তার utility-টা গৌণ। মাঝি গল্প করছিল, এবার অনেকে ইছামতীতে মুক্তা পেয়েছে ঝিনুক তুলে। এ সময়ে বন্যেবুড়ো গাছেও শাল-মঞ্জরীর মত দেখতে সবুজ রং-এর ফুল ফুটেচে—আর এক প্রকার জলজ ঘাসের নীল ফুল ফুটেচে—এর রং ঠিক তিসির ফুলের মত নীল। এক একটা ছোট গাছের মাথায় ছোট ঝোপে ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে অজানা ফুল ফুটে আলো করচে।

কাল রাত্রে কি একটা কথা মনে এল—তার শব্দ-পরম্পরায় মনে একটা অপূর্ব্ব অননুভূত ভাবের উদয় হোল। শব্দেরও ক্ষমতা আছে। প্রমথবাবু বলেন, নেই। এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন তর্ক করেছিলাম।

আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ একেবারে নির্ম্মেঘ, নির্ম্মল। দুঃখ হোল এই ভেবে যে আমিও বারাকপুর থেকে এলাম আকাশও গেল পরিষ্কার হয়ে! আজ এই জন্যে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—বারাকপুরে এমন নীল আকাশটা দেখতে পেলাম না। খুকুর গাওয়া সেদিনকার গানটা বার বার মনে আসতে লাগল—

মোর ঘুম-ঘোরে এলে মনোহর
নমোনমঃ, নমোনমঃ, নমোনমঃ

কাল কলকাতা থেকে এসেছি, বেশ ভাল লাগল আজ সকালে খয়রামারির মাঠ ও বন। বনে সাদা সাদা সেই কুচো ফুল—শীতকালে অজস্র ফোটে এদেশের বনে জঙ্গলে—নদীয়া ও যশোর জেলার সর্ব্বত্র দেখেছি এ সময়ে। কলেজে পড়বার সময় যখন প্রথম প্রথম মামার বাড়ি যেতাম—তখন ভবানীপুরের মাঠের ওদিকের পথ দিয়ে যাবার সময়ে দেখতাম একটা বড় ঝোপে ঐ ফুলটা ফুটে থাকত। কেলো এসেছিল আমার সঙ্গে আমার বাসায়—একসঙ্গে বাক্স, বিছানা বেঁধে বাসা থেকে রওনা হলাম। অনেকদিন পরে ওকে দেখে মনে বড় আনন্দ পেয়েছি কাল।

বড়দিনের ছুটিতে অনেককাল বারাকপুরে আসিনি—এবার এলাম। শীতের পল্লীপ্রান্তরে কি শোভা, তা এতদিন ভুলে ছিলাম। বিকেলে আজ যখন বেলেডাঙ্গা বেড়াতে গেলাম—বনের কোলে সর্ব্বত্র ফুটন্ত ধুর ফুলের প্রাচুর্য্য ও শোভা দেখে মনে হোল, সেদিন মণি বোসের আড্ডায় যারা বল্‌ছিল যে, বাংলাদেশের বনে ফুল তেমন নেই, তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কতটুকু জানে? ক্রোকাস্‌, মার্গারেট্‌ কি কর্ণফ্লাওয়ার এখানে ফোটে না বটে—কিন্তু যে দিকে চোখ তাকাই, সে দিকেই এই যে প্রস্ফুট নীলাভ শুভ্রবর্ণের ধুর ফুলের অপূর্ব্ব সমাবেশ—এর সৌন্দর্য্য কম কিসে? কি প্রাচুর্য্য এই ফুলের—ঝোপের নীচেও যে ফুল—সেখান থেকে থাকে থাকে উঠেচে ঝোপের মাথা পর্যন্ত, আগাগোড়া ভর্ত্তি। এত নীচু ও অত উঁচুতে ও ফুল কি করে গেল তাই ভাবি। ঋতুতে ঋতুতে কত কি ফুল ফোটে আমাদের দেশের বনে-ঝোপে, আমার দুঃখ হয় এর সন্ধানও কেউ রাখে না, নাম পর্য্যন্ত জানে না। অথচ সুন্দরকে যারা ভালবাসে—তারা বাংলার নিভৃত মাঠ বনঝোপের এই অনাদৃত অথচ এই অপূর্ব্ব সুন্দর

ফুলকে কখনো ভুলবে না।

বেলেডাঙ্গায় গিয়ে সেক্‌রার দোকানে বসে গল্প করলাম। ছোট্ট খড়ের ঘরে দোকান। বাঁশের বেড়া। ননী সেক্‌রার মেজছেলে বিড়ি বাঁধ্‌চে—তার দোকান-ঘরের সামনে একটা নতুন কামার-দোকান হয়েচে—সেখানে হাল পোড়াচ্ছে। হালের চারধারে ঘুঁটের সনসনে আগুনে অনেক লোক বসে আগুন পোয়াচ্চে। দোকানের পিছনের বেড়ায় ধুরফুল ফুটে আছে। যেদিকে চাই সেদিকেই এই ফুল—এক জায়গায় মাঠের মধ্যে থাকে থাকে কতদূর পর্য্যন্ত উঠেচে এই ফুলের ঝাড়। রাঙা রোদ ও রাঙা সূর্য্যাস্ত শীতকালের নিজস্ব! এমন অস্ত-আকাশের শোভা অন্য সময় দেখা যায় না।

যুগল বোষ্টমের সঙ্গে দেখা ফিরবার পথে—সে বল্লে তার চলচে না, আমি তার G. T. পড়বার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিনা।

কাল আবার ক্যাম্প-টুলটা নিয়ে কুঠীর মাঠের নিভৃত বনঝোপের ধারে গিয়ে বসলুম। ধুরফুল কি অপূর্ব্ব শোভাতেই ফুটেচে। পাখী এত ভালবাসি কিন্তু কাক ছাড়া কল্‌কাতাতে আর কোন পাখী নেই—এখানে কত কি অজস্র পাখীর কলকাকলি, গাছপালা বন ঝোপের কী সীমারেখা, যেন নৃত্যশীল নটরাজ, ওপারের কাশচরে শিমূলগাছটা দেখা যাচ্ছে, নীলাকাশে রৌদ্র ঝলমল করচে। একটা বাব্‌লাগাছের ফাঁক দিয়ে চাইলে কোন অজানা দেশের কথা মনে আনে—শীতের অপরাহ্নে বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে যে কি সৌন্দর্য্য ভরে থাকে, চোখে না দেখলে সে বোধ হয় নিজেই বিশ্বাস করতুম না। আর দেখলাম এক জায়গায় বসে থাকলে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। ভাল করে সে জায়গার রস অনেক বেশী পাওয়া যায়--কোথায় লাগে গালুডি, কোথায় লাগে কাশ্মীর, কোথায় লাগে ইটালি—আমার মনে কতটুকু আনন্দ ও চিন্তা সে জাগাতে পারে—এই যদি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষের পরিমাপক হয়···তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি ইছামতী তীরের এই নিভৃত বনঝোপ, ধুরফুল-ফোটা মাঠের, রাঙা-রোদমাখা শিমূলগাছের,

বনপাখীর এই কলকাকলির অপরূপ সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। যে পরিদৃশ্যমান আকাশের এক-তৃতীয়াংশে দেড়লক্ষ Super Galaxy আছে, এখানে বসে বসে ভেবে দেখলুম—সে সব বড় বিশ্বের মধ্যে কি আছে না আছে জানিনে—তবে এখানে যা আছে, সেখানেও তাই আছে বলে মনে হয়। What is in microcosm is also in macrocosm—সে সব দার্শনিক আলোচনা এখন থাকুক, বর্ত্তমানে এই সুবৃহৎ বিশ্বের এককোণে ধুরফুল-ফোটা বনঝোপের পাশে ক্যাম্পটুলটা পেতে বসে একটু আনন্দ পাচ্চি, পাই।

অনেক বেলা গেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। একটু আগে যেতাম, খুকু বসে ছিল, বল্লে একটু দেরি করুন, আরও বেলা যাক্। খুব জোর-পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম। বেলডাঙ্গার সেক্‌রার দোকানে —মধ্যে এই ধুরফুল ফোটা বিশাল মাঠটা যেন এক দৌড়ে পার হয়ে গেলাম। তারপর ননী সেক্‌রার কত গল্প শুনলাম বসে বসে। তার ন'টা গরু ছিল, আরবছর ফাগুন মাসে একে একে সব কটা মরে গেল গাল-গলা ফুলে। দোকানের সামনে একজন লোক বসে হাল পোড়াচ্চে আর অত্যন্ত খেলো ও বাজে সিগারেট টানচে। আমি বল্লাম, ও খেয়ো না, ওতে শরীর খারাপ হয়। বল্লে, আমি খাইনে বাবু, এক পয়সায় সে দিন হাটে কিনলাম ছ'টা—তাই এক একটা খাচ্চি!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েচে—কুঠীর মাঠে সুঁড়ি জঙ্গলের পথটা অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, পথ দেখা যায় না। নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম আমাদের ঘাটে—ওপারে একটা নক্ষত্র উঠেচে—সেটার দিকে চেয়ে কত কথা যে মনে পড়ল। ঐ Super Galaxy-দের কথা—বিরাট space ও নীহারিকাদের কথা - এই বনফুল ও পাখীদের কথা! কতক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—এই নক্ষত্রটার সঙ্গে যেন আমার কোন্ অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে—বসে বসে এই শীতের সন্ধ্যায় এই ইছামতীতে কত কি ঘটেছিল পুরোনো দিনে, সে কথা মনে এলো।

গৌরীর কথা মনে এলো—তারপর অন্ধকার খুব ঘন হয়ে এলো। আমি ধীরে ধীরে উঠে বাঁশবনের পথ দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আজ দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিযে আমার সেই পুরোনো জায়গায় বসলাম—সেই যেখান থেকে কুঠীর দেবদারু গাছটা দেখা যায়—কি অপরূপ শোভা যে হয়েচে সেখানে ফুটন্ত ধুরফুলের, তা না দেখলে শুধু লিখে বোঝানো যাবে না। এই যে আমি লিখচি, আমারই মনে থাকবে না অনেকদিন পরে—ওই ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে যাবে মনের মধ্যে। এরকম হয় আমি জানি—তবুও আজই দেখেচি, তাই নবীন অনুভূতির স্পর্দ্ধায় জোর করে বলচি বনফুলের শোভার এ প্রাচুর্য্য আমি দেখিনি। বিহারে নেই, সিংভূমে নেই, নাগপুরে নেই—এই বাংলা দেশের subtropical বন জঙ্গল ছাড়া গাছপালার এই ভঙ্গি ও ফুলের এই প্রাচুর্য্য কোথাও সম্ভব নয়। কেন যে লোকে ছুটে যায় বম্বে, দিল্লী, কাশী, দেওঘর তা বলা কঠিন। বাংলাদেশের এই নিভৃত পল্লী প্রান্তের সৌন্দর্য্য তারা কখনো দেখেনি—তাই।

আজ বিকেলে টুনি, কাতু, জগো, বুধো এদের সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে বনঝোপের ধারে টুলটা পেতে বসলাম। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে গেল—একটা ফুল-ফোটা ঝোপের ধারে কতক্ষণ বসে রইলাম। তারপর একটা নরম কচি, ঘাসে-ভরা জলার ধারে মুক্ত সান্ধ্য হাওয়ায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করলুম কতক্ষণ—আমি এই সবই ভালবাসি। সাধে কি কলকাতা বিষ লাগে! এই শীতকালের সন্ধ্যায় এতক্ষণ ধোঁয়ায় সারা কলকাতা শহর ভরে গিয়েচে—আর এখানে কত ডাহুক, জলপিপি, দোয়েল, শালিকের আনন্দ কাকলি, কত ফুটন্ত বনফুলের মেলা, কি নির্ম্মল শীতের সন্ধ্যার বাতাস, কি রঙিন অস্তদিগন্তের রূপ, শিরীষ গাছে কাঁচা শুঁটি ঝুলচে, তিত্তিরাজ গাছে কাঁচা ফলের থোলো দুলচে, জলার ধারে ধারে নীল-কলমী ফুল ফুটেচে। মটর শাক, কচি খেঁসারি শাকের শ্যামল

সৌন্দর্য্য—এই আকাশ, এই মাঠ, এই বন, এই সন্ধ্যায়-ওঠা প্রথম তারাটি—জীবনে এরা আমার প্রিয়, এদেরই ভালবাসি, এরাই আবাল্য আমার অতি পরিচিত সাথী—এদের হারিয়ে ফেলেই তো যত কষ্ট পাই!

বিকেলে আজ বেলভাঙার মরগাঙের আগাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় এক বোঝা পাকাটির ওপর গিয়ে বসে ওবেলার সেই কথাটা চিন্তা করছিলাম—ভগবান তাঁর পূজা না পেলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠেন না—ওঁর পূজোর সঙ্গে ভয়ের কোন সম্পর্ক নেই—তাঁর যে পূজো, সে শুধু প্রেমের ও ভক্তির, এই পাড়াগাঁয়ে এদের সেকথা বোঝানো শক্ত। পূজোর ঘরে বসে আজ ওবেলা যখন শালগ্রাম পূজা করছিলাম, তখনই আমার মনে হোল, এই ঘরের বদ্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনার মধ্যে ভগবান নেই, তাঁকে আজ বিকেলে খুঁজবো সুন্দরপুরের কিংবা নতিডাঙ্গার বাঁওড়ের ধারে মাঠে, নীল আকাশের তলায়, অস্ত-বেলার পাখীদের কলকাকলির মধ্যে। তাই ওখানে গিয়ে বসেছিলাম।

বসে বসে কিন্তু আজমাবাদের কথা মনে এলো। এই পৌষ মাসে ঠিক এই সময়ে আমি সেখানে যেতুম, ঠিক এই বিকেলে রাঙা রোদের আভা মাখানো তিনটাঙার বনের ভেতর দিয়ে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপারে যেতুম ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে—কলাইক্ষেত থেকে কলাইয়ের বোঝা মাথায় মেয়েরা আসতো, গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকা চলে যেত মুঙ্গেরের দিকে, ভীমদাস-টোলায় আগুনের চারিধারে বসে গ্রামের লোকে গল্পগুজব করতো। ফিরবার পথে বাঁধের ওপর ওঠবার সময় দেখতুম চারিধারের মাঠ কুয়াশায় ভরে গিয়েচে—সেই ছবিগুলো মনে হলো। তার চেয়ে যে আমাদের দেশের ভূমিশ্রী, এই নির্জ্জন শান্তিতে ভরা অপরূপ সুন্দর পল্লীপ্রান্ত, ওই মরগাঙের শুক্‌নো আগাড়ের নতুন কচি ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্চে যে গরুর দল, ওই দূরের বটগাছটা, মাঠের ওপারের বনফুল-ফোটা বনঝোপ, এই ডাহুক

পাখীর ডাক, গ্রামসীমার বাঁশবন—এসব যে রূপের বিত্তে নিঃস্ব তা নয়, বরং আমার মনে হয় এরা বিহারের সেই বৃক্ষলতা-বিরল প্রান্তরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধতর, কিন্তু সেখানে একটা জিনিস ছিল, যা বাংলাদেশের এ অঞ্চলে অন্ততঃ নেই—Space! ··Wide open Space! দূরবিসর্পী দিগ্বলয়, দূরত্বের অনুভূতি, একটা অদ্ভুত মুক্তির আনন্দ—এ যেমন পেয়েছিলাম ইসমাইলপুরের দিয়ারাতে ও আজমাবাদে—আর কোথাও তা মিলবে না।

আজ খুকু দুপুরে খানিকটা বসে রইল—আমি মাঠে বেড়াতে যাবো বলে গোপালনগরে গেলাম না। মরগাঙের আগাড়ে আজও অনেকক্ষণ গিয়ে বসে ছিলাম। বেলেডাঙ্গার পুলের কাছে ফিরবার পথে কি একটা বনফুলের সুগন্ধ বেরুল—খুঁজে বার করে দেখি কাঁটাওয়ালা একটা লতার ফুল। লতাটা আমি চিনি, নাম জানিনে। ননী সেকরার দোকানের কাছেই ঝোপটা। ননী কাদা দিয়ে রূপো গালাবার মুচি গড়চে। ওদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার পরে নদীর ধারে এসে খানিকটা দাঁড়ালাম—ওপারে কালপুরুষ উঠেচে, নীল Rigel-এর আলো নদীর জলে পড়েছে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে ওপারের তারাটার দিকে চেয়ে থাকবার যে আনন্দ, যে অনুভূতি, তার বর্ণনা দেওয়া না—কারণ অনুভূতির স্বরূপ তাতে বর্ণিত হয় না, অথচ কতকগুলো অর্থহীন কথা দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে অনুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়। এ অব্যক্ত, অবর্ণীয়।

আজ এই সন্ধ্যাতেই একটা উল্কাপাত দেখলাম—ওপাড়ার ঘাটের মাঝামাঝি আকাশে—প্রথমে দেখা, তারপর নীল ও বেগুনি রং হয়ে গেল জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে—জলে ছায়া পড়ল। আমি অমন ধরনের উল্কাপাত দেখিনি!

আজ এখানে বেশ শীত পড়েচে। দুপুরের আগে ফুল-ফোটা মাঠে বেড়াতে যাওয়া আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। আজ আকাশ কি

অদ্ভুত ধরণের নীল ! কুঠীর সেই দেবদারু গাছটা, কানাই ডোঙার গাছ, শিরীষ, তিত্তিরাজ কি সুন্দর যে দেখাচ্চে নীল আকাশের পট-ভূমিতে ! মাঝে মাঝে দু'একটা চিল উড়চে বহুদূরে নীল আকাশের পথে ! এসব ছবি মনে করে রাখবার জিনিস। কি আনন্দ দেয়, কত অননুভূত ভাব ও ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত করে এরা। প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতির এই রূপ মনে নতুন ধরণের অনুভূতি ও চিন্তা এনে দেয়। এ জীবনে কতবার দেখলাম —তার প্রমাণ পাই প্রতি সন্ধ্যায় আজকাল কুঠীর মাঠ থেকে ফিরবার পথে, নিভৃত সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের চরের আকাশে প্রথম-ওঠা দু'চারটা নক্ষত্রের দিকে যখন চেয়ে থাকি তখনই বুঝতে পারি। যে দেবলোকের সংবাদ তখন আমার মনের নিভৃত কন্দরে ঐ রিগেল্ বা অন্য অজানা নক্ষত্র বহন করে আনে সে গহনা গভীর উদাত্ত বাণী অমৃতের মত মনকে বৈচিত্র্যময় করে, সাধারণ পৃথিবীর কত উর্দ্ধলোকের আয়তনে মনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় একমুহূর্ত্তে। এ একটা বড় সত্য। বড় বড় সাধক, কবি, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রকর, শিল্পী — যাদের চিন্তা আর ভাব নিয়ে কারবার, এ সত্যটা তাদের অজ্ঞাত নয়। এজন্যেই এমার্সন বলেচেন, "Every literary man should embrace solitude as a bride." এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল গত জুলাই মাসের Adelphi কাগজে বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। নির্ব্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকালোক'। জার্ম্মান মিস্টিক্ একহার্ট কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না—তাঁর "Our Heart's Brotherhood" গাথাগুলির মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে এ কথার।

ওকথা যাক্। আমি নিজের একটা ভুল আবিষ্কার করেচি, যাকে এতদিন বলে এসেচি ধুরফুল, তার আসল নাম হোল এড়াঞ্চির ফুল। ধুরফুল লতার ফুল বিলবিলেতে ছিল, সাদা বড় বড় ফুল ফুটত—

পুঁটি দিদি বলছিল। আজকাল আর দেখা যায় না। শ্যাম-লতা, ভোমরা-লতার ফুলও এসময় ফোটে। আগে নাকি আমাদের পাড়ার ঘাটে শ্যাম-লতার ফুল ফুটে বৈকালের বাতাসকে মধুর অলস গন্ধে ভরিয়ে দিত—আজকাল সে লতাও নেই, সে ফুলও নেই।

কাল সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কুঠীর মাঠে বেড়াতে বেড়াতে রঙীন অস্ত-আকাশের দিকে চেয়ে অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে কত বিচিত্র ধরণের গাছপালার সীমারেখা দেখলাম—এদের এখানে যা রূপ, তা এক যদি ভারতবর্ষের মধ্যে মালাবার উপকূলে এবং আসাম ও হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের অধিত্যকায় থাকে—আর কোথাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

ছোট এড়াঞ্চির ফুল সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েচে। কাল যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে বেলেডাঙ্গার গোয়ালপাড়ায় গেলাম—উঁচুনিচু মাটি ও ডাঙা পাশে রেখে, ফুল ফোটা বড় বড় বনঝোপের নীচে দিয়ে—কত কি পাখী বেড়াচ্চে ঝোপের নীচে শুকনো পাতার রাশির ওপরে। কাঁটাওয়ালা সেই সবুজ লতাটায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে—খুকু বল্লে, বনতারা।—নামটি ভারি সুন্দর, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা গেল না ও কোন লতার কথা বলচে—আর চারিদিকে অজস্রসম্ভারে ঢেলে দেওয়া ছোট এড়াঞ্চির ফুল। বনে, ঝোপে, বাবলাগাছের মাথায়, কুলগাছের ডালে, বেড়ার গায়ে, ডাঙাতে যে দিকেই চাই সেই দিকে ওই সাদা ফুলের রাশি। আমি বাংলায়ও বনের এমন রূপ আর কখনো দেখিনি। যদি জ্যোৎস্না রাত্রে এই রূপ দেখতে পেতাম!

এ ক'দিন ছিলাম কলকাতায়। ওরিয়েন্টাল সোসাইটির প্রদর্শনীতে এবার নন্দলাল বসুর দু'খানি বড় সুন্দর ছবি দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। খুকু ও জাহ্নবীর মেয়ে খুকী সঙ্গে ছিল—তারাও দেখেছে, তবে নন্দবাবুর ছবির তারা কি বুঝবে? ওদের দেখালুম বায়োস্কোপ, জু, সার্কাস্—আর এখানে ওখানে নিয়ে বেড়ালুম। একদিন সজনী দাসের বাড়ি, একদিন নীরদের বাড়ি, একদিন নীরদ দাসগুপ্তের ওখানে। দুঃখ হোল যে এখানে এসময়ে সুপ্রভা

কাল নৌকায় বনগাঁ থেকে এলাম। কি অদ্ভুত রূপ দেখলাম সন্ধ্যায় নদীর। শীতও খুব, অন্ধকার হয়ে গেল। কল্‌কাতার হৈ চৈ-এর পরে এই শান্ত সন্ধ্যা, ফুল ফোটা বন, মাঠ, কালো নিথর নদীজল মনের সমস্ত সংকীর্ণ অবসাদ দূর করে দিয়েছে। চালতেপোতার বাঁকে বনের মাথায় প্রথম একটি তারা উঠেছে—কত দূর দেশের সংবাদ আলোর পাখায় বহন করে আনচে আমাদের এই ক্ষুদ্র, গ্রাম্য নদীর চরে—আমার মনের নিভৃত কোণে।

ঘাটে যখন নামলুম, তখন খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। খুকু ও আমি জিনিসপত্র নিয়ে বাঁশবনের অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে বাড়ি এলুম, খুকু তো একবার ভয়ে চীৎকার করে উঠল কি দেখে। ভয়ের কারণ এই যে, এসময়ে আমাদের দেশে বাঘের ভয় হয়।

দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে কুঠীর এদিকে বনের মধ্যে সেই যে ঢিবিটা আছে, সেখানে খানিকটা বসলুম—তার পরে একটা নাবাল জমি, আর ওপারে সেই বটগাছটা। আকাশ কি অদ্ভুত নীল! ছোট এড়াঞ্চির ফুল এখনও ঠিক সেই রকমই আছে—কদিন আগে যা দেখে গিয়েচি, সৌন্দর্য্য এখনও ম্লান হয় নি। প্রায় পনেরো দিন ধরে এর সৌন্দর্য্য সমান ভাবে রয়েচে, এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। এমন কোন বনের ফুলের কথা আমার জানা নেই, যা ফুটন্ত অবস্থায় এতদিন থাকে। বালজ্যাকের গল্পটা (Atheist's Mass) তখনই পড়ে সবে বেড়াতে গিয়েচি, আকাশ যেন আরও নীল দেখাচ্ছিল, বনফুল ফোটা ঝোপ আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। নাইতে গিয়ে বাঁশতলার ঘাট পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়ে এলাম।

বিকেলে ক্যাম্প-টুলটা নিয়ে গিয়ে কুঠীর সেই ঢিবিটাতেই অনেকক্ষণ বসে রইলুম—রোদ রাঙা হয়ে গেল, ওপারের শিমূলগাছটার মাথার ওপর উঠে গেল, তখনও আমি চুপ করে বসে আছি। (কি ভয়ানক শীত পড়েচে। এবার, এই যে লিখচি আঙুল যেন অবশ

হয়ে আসচে। আমার সামনে পেছনে ফুল-ফোটা সেই ঝোপ বন, পাশেই নদী। একবার ভাবলুম বেলডাঙ্গায় যাবো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঠতে পারা গেল না এই সৌন্দর্য্যভূমি ছেড়ে।

নির্জ্জন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মত নদীতীরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর পারের দ্যুতিলোকের দিকে চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ওপারের চরের ওপরে উঠেচে কালপুরুষ, তারপর এখানে ওখানে ছড়ানো দু'চার দশটা তারা। এই নিভৃত সন্ধ্যার আনন্দ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক—আমি দেখচি কুঠীর মাঠের যে আনন্দ তার প্রকৃতি Aesthetic, কিন্তু এই জনহীন নদীতীরে কুঁচঝোপ, বাঁশবন, ওপারের খড়ের মাঠ, এদের সবার ওপরকার ওই দ্যুতিলোক যে বাণী প্রাণে এনে পৌঁছে দেয়, তা বিশ্ব-লোকের এবং অন্তরলোকের যিনি অদৃশ্য অধিদেবতা, তাঁর বাণী—আজকাল যেন তার প্রকৃতি একটু একটু বুঝতে পারি। আর আসলে বুঝতে ওইটুকু পারি বলেই তো তা আমার কাছে তাঁর বাণী এবং পরম সত্য, নইলে তো মিথ্যে হোত। যা ধরতে পারিনে, বুঝতে পারিনে, আমার কাছে তা ব্যর্থ।

কাল দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে অনেকগুলি ভাল ভাল ফরাসী গল্প পড়লাম। তারপর স্নানের পূর্ব্বে কুঠীর মাঠ বেড়িয়ে এলাম। যে জায়গাটাতে অনেকদিন যাইনি—সেই চারিদিক বনে ঘেরা ধুধুল-ফোটা ঝোপের বেড়া দেওয়া মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। শীতের দুপুরে নীল আকাশের রূপ, আর সূর্য্যাস্তের রূপ—এদের অন্য কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। শীতকালে ইসমাইলপুর আর আজমাবাদের দিগন্তব্যাপী মাঠের প্রান্তে রাঙা সূর্য্যাস্ত দেখে ভাবতাম এ বুঝি বিহারের চরের নিজস্ব সম্পত্তি—কিন্তু এবার দেখলাম বাংলাদেশেও অমনি রক্তাভ অস্তদিগন্ত স্বমহিমায় প্রকাশ পায়। আজ বিকালেও সূর্য্যাস্তের শোভা দেখবার জন্যে কুঠীর মাঠে গিয়ে এক জায়গায় কটা রোদ-পোড়া ঘাসের ওপর গায়ের আলোয়ানখানা বিছিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ডাইনে

একটা বাব্‌লাগাছের শুক্‌নো মগ্‌ডালে অনেক পাখী এসে বসে যেন নামজাদা চীনে চিত্রকরের একটা ছবি তৈরী করেচে। সামনের বনঝোপ, কুঠীর শিরীষ গাছে রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, নীল আকাশের কি রূপ! বারাকপুরে আর হয়তো কখনো আসবো না— কুঠীর মাঠ আর দেখবো কি না কি জানি! আজকার এই অপরাহ্ন যেন চিরদিন মনে থাকে—এর সুখ, আনন্দও এর দুঃখ। মাঠ থেকে উঠে গেলাম গঙ্গাচরণের দোকানে—সেখানে সবাই বসে দেশবিদেশের গল্প করচে! আশ্বিনী যাত্রা-দলের বাজিয়ে, এখানেই ঘর বেঁধে বাস করে। তার বাড়ি পূর্ণ গোঁসাই বলে একটা লোক এসেছিল —সে এখানে এসে গল্প করে গিয়েচে যে, সে বিলেতে ঘুরে এসেচে। প্রমাণ স্বরূপ বলেছ কোথায় নাকি প্রকাণ্ড পিতলের মুর্ত্তি সে দেখেচে —এ দ্বীপে একখানা—পা, আর একটা দ্বীপে আর একখানা পা— তার তলা দিয়ে সে জাহাজে ক'রে গিয়েচে। এক একটা অকাট্য প্রমাণ অবিশ্যি যে, সে লোকটা বিলেতে গিয়েছিল!

আজই যাবার কথা ছিল কিন্তু খুকু বল্লে আজ থাকুন। গত শনিবারে খুকুদের বাড়ি বারাকপুরে গিয়েছিলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল পৈঠেতে আসার সময়। সকালে গোঁসাই বাড়ির পাঠশালা Examine করতে গেলাম। বোষ্টম বুড়ীর বাড়ির সামনে বড় বট-গাছের তলায় যুগল বসে কথা বলচে একজন বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে। বৃদ্ধ বলচে, 'আমাদের দিন পার হয়ে গিয়েচে, বেলা চারটে, এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পথ দেখাও, পথ দেখাও।' কথাটা আমার বড় ভাল লাগল। দুপুরে আটির ধারে মাঠে যেমন রোজ বেড়াতে যাই, আজও গেলাম। দুপুরের আকাশ যেমন নীল, অপরূপ নীল—এমন কিন্তু অন্য কোন সময়ে পাইনি। দুপুরের পরে খুকু এসে অনেকক্ষণ ছিল। তাই দুপুরে কিছু লেখা হয়ে উঠল না। বিকেলে আমি গিয়ে কুঠীর মাঠে একটা নিভৃত স্থানে গায়ের আলোয়ানখানা ঘাসের ওপর বিছিয়ে তার ওপর চুপ করে বসে রইলাম। এতে যে আমি কি আনন্দ

পাই! একটা অনুভূতি হোল আজ, ঠিক সেই সময় রাঙা রোদ ভরা আকাশের নিচের গাছপালায় আঁকা-বাঁকা শীর্ষদেশ লক্ষ্য করতে করতে।

সকালে উঠে নৌকাতে আবার বনগাঁয়ে যাচ্চি। জলের ধারে ধারে মাছরাঙা পাখী বসে আছে নলবনে। কাঁটাকুমুরে লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরেচে। তবে ফুলের শোভা নেই, গন্ধই যা আছে।

বড়দিনের ছুটি শেষ হোল। আবার কল্‌কাতায় ফিরতে হবে। কে জানে, কবে আবার দেশে ফিরতে পারব!

মৌরীফুল

অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুয্যে বাড়ির পিছনে বাঁশ-বাগানে জোনাকীর দল সাঁজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশবাগানের পিছনটা সূর্য্যাস্তের শেষ আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখুয্যেদের অন্দর-বাড়ি হইতে এক তুমুল কলরব আর হইচই উঠিল!

বৃদ্ধ রামতনু মুখুয্যে শিবকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তিনি রোজ সন্ধ্যাবেলায় আরতি দিয়া থাকেন, এজন্য প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি তাঁর চাই। তিনি নানা উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিয়া দেন। অন্যদিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে ঘি-টা ছিল, তাঁর পুত্রবধূ সুশীলা সেই বাটি তাকের উপর হইতে পাড়িয়া সেই ঘি-টার সমস্তই দিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়াছে।

রামতনু মুখুয্যে মহকুমার কোর্টে গিয়াছিলেন, ও-পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে।

বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি গত মে মাসে পাঁচু রায় আর তার ভাইয়ের পাঁচিলের জায়গা নিয়ে

মামলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন না ?

রামতনু মুখুয্যে বলিয়াছিলেন—হাঁ, তিনি ছিলেন।

উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন—তু-নালির চৌধুরীদের কান-সোনার মাঠের দাঙ্গার মোকদ্দমায় আপনি পুলিশের দিকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন কি না ?

রামতনু মহাশয়কে ঢোঁক গিলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে।

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি বাদীপক্ষের সাক্ষী ছিলেন কিনা ?

কবে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মুখুয্যে মহাশয় প্রথমটা তাহা মনে করিতে পারেন নাই, তারপর বিপক্ষের উকীলের পুনঃ পুনঃ কড়া প্রশ্নে এবং মুন্সেফবাবুর ভ্রূকুটিমিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য রামতনুর মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বটে এবং এই গত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন।

তারপর কোর্টে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতনুর উপর কি ব্যাঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, রামতনু উকীল-আমলায় ভর্ত্তি মুন্সেফবাবুর এজলাসে হঠাৎ কিরূপে সপুষ্প সর্ষপক্ষেত্র আবিষ্কার করেন, সে-সকল কথা উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে মোটের উপর বলা যায়, রামতনু মুখুয্যে যখন বাটী আসিয়া পৌঁছি-লেন, তখন তাঁর শরীরের ও মনের অবস্থা খুবই খারাপ। কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শ্রীগুরুর উদ্দেশে আহুতি দিয়া অনিত্য বিষয়-বিষে জর্জরিত মনকে একটু স্থির করিবেন, না দেখেন যে আহুতির জন্য আলাদা করিয়া তোলা যে ঘিটুকু তাতে ছিল তাহার সবটাই একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

তারপর প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া মুখুয্যে বাড়ির অন্দর মহলে একটা রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রবধু সুশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সামলাইয়া লইয়া এমন সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন আঠারো বৎসর

বয়স্কা তরুণীর মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকীলের অপমানে ও ঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখুয্যে পুত্রবধূর পিতৃকুল ও তাঁহার নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমন সব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে বোধহয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভুবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শবিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

এমন সময় মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাড়ি আসিল। তাঁহার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, বেশী লেখাপড়া না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ন'টাকা বেতনে মুজুরীগিরি করিত।

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকারেই জামাকাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত-পা ধুইতে গেল। তারপর ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে সুশীলা তাহার সম্মুখের বাতাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুরগাড়ী ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব না দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া বাঁশের লাঠিগাছা ঘরের কোণ হইতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়বাড়ির চণ্ডী মণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকদিগের যাত্রার আখড়াই ও রিহার্সেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্ম্মের ভিতর।

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ বাঁচাইবার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় মুখুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয় করিতেন; তাঁহাকে রামতনু জানাইলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই কাশী যাইতেছেন, কারণ আর এ বয়সে—'ইত্যাদি।···

তাঁহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষার জন্য দায়ী একমাত্র

তাঁহার পুত্রবধূ সুশীলা। সুশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। তাহার জন্য রামতনু মুখুয্যের বাড়িতে কাক, চিল বসিবার উপায় নাই। শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে সে হঠাৎ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় না।

অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারাদি শেষ করিয়া সে শুইতে গিয়া দেখিল, স্ত্রী ঘুমজড়ানো চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল—কখন এলে? তা আমায় একটু ডাকলে না কেন?

কিশোরী বলিল—আব ডেকে কি হবে? আমার কি হাত পা নেই! নিতে জানি নে!

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল—নিতে জান তো জেনো, কাল থেকে আমার এখানে আর বনবে না। এ যেন হয়েছে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়ীসুদ্ধ লোক আমার পেছনে এমন করে লেগেছে কেন শুনতে চাই! না হয় বরং……

কান্নায় ফুলিয়া সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিল।

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত দুপুরের সময় গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে বুঝি। এরকম করিয়া আর সংসার করা চলে না—ভাত ঢাকা ছিল, খুলিয়া লইয়া খাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়া যায় তাহা হইলে আর পারা যায় না; কিছু না, ও একটা ছল; ঐ সামান্য সূত্র ধরিয়া এখনি সে একটা রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবে।

কিশোরী বলিল—যা খুশী কালকে কোরো—এখন একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ, কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে ওঠাবো।

সুশীলা কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রামতনু মুখুয্যে শুনিলেন, চৌধুরীরা খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—ও বউমা, একটু সকাল সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।

বেলা নয়টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—সুশীলা স্নান করিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, গৃহিনী মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকিদার হাঁকায় সুরে বলিতে লাগিলেন—হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না হয় বাপু এর একটা বিহিত করো। সেই সকাল থেকে ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বলছি—ও বউমা, দুটো ভাত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো-কিছু রাঁধ—হাতে পায়ে ধরতে কেবল বাকী রেখেছি। কার কথা কে শোনে?—এই বেলা দুপুরের সময় রানী এখন এলেন নেয়ে…

সুশীলা রক হইতেই সমান গলায় উত্তর দিল—মাইনে করা দাসী তো নই, আমি যখন পারবো রান্না চড়াবো—সকাল থেকে বসে আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে আবার আটটার মধ্যে ভাত দেবো—মানুষের তো আর শরীর নয়—যার না চলবে সে নিজে গিয়ে রেঁধে নিক……

এ কথার উত্তরে মোক্ষদা খুন্তী হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্ত্তনের একটা আধুনিক সংস্করণ শুরু করিতে যাইতেছিলেন—একটা ঘটনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

একটা দশ-বারো বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণ, পরনে অতি ময়লা এক গামছা, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে ছোট একটা বাখারির ছড়ি লইয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিলে। ছেলেটি পাশের গ্রামের আতর আলী ঘরামীর ছেলে গত বৎসর তার বাপ মারা গিয়েছে, দুটি ছোট ছোট বোন আর মা

ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব খারাপ, সবদিন খাওয়া জোটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি বাজাইয়া হাপু গাহিয়া মা ও বোন ছুটিকে প্রতিপালন করে। সে এ-গ্রামের প্রায় সব বাড়িতে আসিত কিন্তু মুখুজ্যে বাড়ি আর কখনো আসে নাই তাহার একটা কারণ এই যে, দানশীলতার জন্য রামতনু মুখুয্যে গ্রামের মধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ছেলেটি উঠানে দাঁড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল।

তিনটি নেহাত গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রামতনুর মেজাজ ভাল ছিল না, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—থাম্—থাম্, ওসব রাখ্—এখন ও সব দেখবার শখ্ নেই—যা অন্য বাড়ি দেখগে যা—যা……

সুশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক হইয়া হাপু গাওয়া দেখিতেছিল—ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়ে তাহাকে ডাকিল, বলিল--শোন, তার বাড়ি কোথায় রে?

—হরিশপুর মা-ঠাকুরুন।

—তোর বাড়িতে কে আছে আর?

—মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকুরুণ—মোদের আর কেউ নাই, মুই বড়, ছোট দুটো বোন আছে……

—তাই বুঝি তুই হাপু গাস? হ্যাঁ রে, এতে চলে?

রামতনুর ধমক খাইয়া ছেলেমানুষ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল, সুশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল—চোখের জল হু হু করিয়া পড়িতেই ম্যালেরিয়াশীর্ণ হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—না মা-ঠাকরুণ, চলে না। এ-সব লোকে আর দেখতে চায় না। মুই যদি ভাল গান গাইতি পারতাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের সংসারের—এই শীতে

মা-ঠাকরুণ······

সুশীলা বাধা দিয়ে বলিল—দাঁড়া, আমি আসছি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতি কষ্টে সামলাইয়া চাহিয়া দেখিল আলনায় একখানা নূতন মোটা বিছানার চাদর ঝুলিতেছে, হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া টানিয়া লইল। তারপর জানালা দিয়া বাড়ির মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া চাদরখানা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল—এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত বেশ কাটবে। কাটবে না? খুব মোটা। শীগগির যা, লুকিয়ে নিয়ে যা, কেউ যেন না দেখে ··

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুশীলা বলিল—ওরে এক্ষুণি কে এসে পড়বে, শীগগীর যা ·····

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীলা ভিতর বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন। ছেলেটার দুঃখে সুশীলার মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল, সে গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কিছু দেব বাবা?

মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, হাঁড়িটা দেখ, নয় তো বল নিজে মরি-বাঁচি একরকম করে, সাঙ্গ করে, তুলি।

রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন! এই-সব ব্যাপারেই সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া যাইত, রামতনু পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে বা অপমান করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাঁধিয়া রণে আগুয়ান হইত। সে-ই বা ছাড়িবে কেন?

মাস দুই পরে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। কিশোরী

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে। বাড়িতে যে যাহার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুশীলা ঘরের মেজেয় বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে। কিশোরী সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে।

সুশীলা চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হাসিল, বলিল—বলবো কেন?

—থাক, না বলো, ভাত দাও। রাত কম হয়নি। আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে।

সুশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী আসিয়া সে কি লিখিতেছে দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছে না, স্বামীকে কথা বলাইবার এ তার একটা পুরানো কৌশল মাত্র। অনেক দিন সে স্বামীর মুখে দুটো ভালো কথা শুনে নাই, তাহার নারী-হৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই জন্য সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতেও এই সামান্য ফাঁদটি পাতিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু কিশোরী ফাঁদে পা দেওয়া দূরে থাকুক, সেদিকে ঘেঁষিলও না দেখিয়া সুশীলা বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কাগজ কলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপচাপ অবস্থায় আহারাদি শেষ করিয়া কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। আশায় বুক বাঁধিয়া সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি পাতিল।

—একটা গল্প বলো না? অনেক দিন তো বলনি, বলবে লক্ষ্মীটি······

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য উপন্যাস হইতে নানা গল্প বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া সুশীল মুগ্ধ হইয়া যাইত। জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন-পরীদের জগৎ······খেজুর বনের মধ্যে

ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে···· পথহীন দুরন্ত মরুপ্রান্তের মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, সমুদ্রের ঝড় তরুণ শাহ্‌জাদাগণের দৈত্যসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা—এ-সব শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যে অর্দ্ধরাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীনদেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহ্‌জাহাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকে যাত্রার দলের রাজার পোশাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহ্‌জাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এই রকম গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়ক-নায়িকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া সে স্বামীকে প্রথম ভালবাসে। সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা, কিন্তু সুশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই!

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল—হ্যাঁ, গল্প বলবো! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত-দুপুরে বকবক করি আর কি। তোমাদের কি? বাড়ি বসে' সব পোষায়।

অন্য মেয়ে হইলে চুপ করিয়া যাইত। সুশীলার মেজাজ ছিল একগুঁয়ে, সে আবার বলিল, তা হোক, একটা বলো, রাত এখন তো বেশী নয় ·····

—না বেশী নয়—তোমার তো রাত কম-বেশীর জ্ঞান কত! নাও চুপচাপ শুয়ে পড় এখন

সুশীলা এইবার জিদ ধরিল—বলো না একটা, ছোট দেখেই না হয় বলো—এত করে বলছি একটা কথা রাখতে পারো না?

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ! এ তো বড় জ্বালা হ'ল। রাতেও একটু ঘুমুবার জো নেই—সমস্ত দিন তো গলাবাজিতে বাড়ি সরগরম রাখবে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?

এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে একথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল—বেশ করি গলাবাজি করি, তাতে অসুবিধা হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে—রাত দুপুর করলে কে! নিজে আসবেন রাত দুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে—কে এত রাত পর্য্যন্ত ভাত নিয়ে ব'সে থাকে? নিজেরই দেহ, পরের আর তো দেহ না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি? নিজের খাটনিটাই কেবল···

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর চড়া সুরে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। —উঠিয়া বসিয়া প্রথমে স্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাঁট বসাইল, তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর হইতে নামাইয়া ধাক্কা মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, বলিল—বেরো, ঘর থেকে বেরো, আপদ দূর হ—রাত দুপুরেও একটু শান্তি নেই—যা বেরো—যেখানে খুশী যা···

ঘরের আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল স্ত্রী দুই হাতে নখ দিয়া আঁচড়াইয়া তাহার হাতের আঙুলগুলিতে রক্তপাত করিয়া দিয়াছে।

ইরানী শাহ্‌জাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী মধ্যে মধ্যে দুরন্ত স্ত্রীর প্রতি এরূপ ঔষধি প্রয়োগ করিত।

শেষ রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন ফুলের পাপড়ির মত সাদা, ভোর রাত্রের বাতাস নেবু-ফুলের গন্ধে আর পাপিয়ার গানে মাখামাখি, সুশীলা তখন ঘরের দোরের বাহিরে আঁচল পাতিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল।

সকাল হইলে যে-যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা বলিলেন—বউমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পূজো দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল সকাল সেরে নাও।

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামতনু মুখুয্যের প্রতিপালক, ইহারাই গ্রামের জমিদার এবং ইহাদেরই জমি-জমা সংক্রান্ত মকদ্দমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া রামতনু অন্নসংস্থান করিতেন।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ভালো কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল—দুই ঘণ্টার পথ। চৌধুরী-বাড়িতে কলিকাতা হইতে একটি বউ আসিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, এম-এ পাশ করিয়া বছর দুই হইল ডেপুটিগিরি চাকরি পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, চৌধুরীদের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক আছে, এজন্য চৌধুরীগৃহিণী রাসপূর্ণিমার সময় তাহাকে আনাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সে কখনো পাড়াগাঁয়ে আসে নাই। নৌকায় খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর বউটি দেখিল, নীলাম্বরী কাপড় পরনে তাহারই সমবয়সী আর-একটি বউ উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি সন্তুষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়-চোপড় পরিবার অগোছাল ধরন দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভালো নয়। নৌকার ও-ধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত সাবিত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠার কি কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত বড়মানুষী ফর্দ্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বউটি লেখাপড়া জানিত এবং দেশ-বিদেশের খবরাখবরও কিছু কিছু রাখিত—চৌধুরীগৃহিণীর একঘেয়ে বড়মানুষী চালের কথাবার্ত্তায় সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া, থাকিবার পর, সে লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিতর হইতে কালো কালো ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ভাই ?

সুশীলা সন্দিগ্ধসুরে বলিল—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সুশীলার রকম-সকল দেখিয়া বউটির খুব হাসি পাইতে লাগিল। সে বলিল—অত ঘোমটা কিসের ভাই ? তুমি আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও এস, ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি।

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই সুশীলার ঘোমটা খুলিয়া দিল—সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল ; রং যদিও ততটা ফরসা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণ-শ্যাম কলমী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারা মুখখানায় মাখানো। মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল—উনি বসে আছেন কে ভাই, শাশুড়ী ?

—হ্যাঁ।

—এস, আর একটু সরে এস ভাই, দুজনে গল্প করি আর দেখতে দেখতে যাই। তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ভাই ?

সুশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল—সে হ'ল শিমলে ?

—কোন শিমলে ? কলকাতা শিমলে ?

কলকাতায় শিমলে আছে নাকি ? কৈ তাহা তো সুশীলা কোনদিন শোনে নাই, বলিল—আমার বাপের বাড়ি এখেন থেকে বেশী দূর নয়, পাঁচ'ছ কোশ পথ, গরুর গাড়ি করে যেতে হয়।

নদীর ধারে যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনোগাছপালা দেখিয়া বউটি খুব খুশি। এ-সব সে পূর্ব্বে বড় দেখে নাই, আঙুল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া বলিল—বাঃ, খুব সুন্দর তো ! ওটা কি পাখী ভাই ?

ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি কখনো ?

বউটি বলিল—ভাই, আমি কলকাতার বাইরে অ্যাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে চন্দননগরে বাগানবাড়িতে যাবার কথা মনে আছে, তারপর এই আসছি—তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল ; ওটা কিসের ক্ষেত ভাই ?

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর ধারের একটা মৌরীর ক্ষেত দেখাইতেছে—প্রথমটা সে সঙ্গিনীর চোখ ঝলসানো রং, অদৃষ্টপূর্ব্ব দামী সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ এবং চিকচিকে নেক্‌লেসের বাহার দেখিয়া যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া

সুশীলার সে ভয় কাটিয়া অঙ্ক-সঙ্গিনীর উপর একটু স্নেহ আসিল—কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত, এ-সব সামান্য জিনিসও নাই নাকি? সুশীলা হাসিয়া বলিল—তুমি ফুলের গন্ধ দেখে বুঝতে পার না ভাই? ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ির গাঁয়ে কত তো মৌরীর ক্ষেত আছে—মৌরীর শাক কখনো খাওনি? কলকাতায় বুঝি নেই?

কলিকাতার বউটি বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্ত্তমান অবস্থায় সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর নয়, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

ঘণ্টা খানেক পরে যখন নৌকা শিবতলার ঘাটে গিয়া লাগিল, তখন তাহাদের তুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল—সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁকপাইলেই মাথা তোলে। প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হুহু করিয়া উঠিল।

তুজনে তাহারা খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে এদিকে ওদিকে বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক! নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া আছে!···ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া কেমন ঝিমায়! ··

কলকাতার বউটি বলিল—এস ভাই, আমরা একটা কিছু পাতাই, কেমন?

সুশীলা খুশী হইয়া বলিল—খুব ভাল ভাই, কি পাতাব বলো···

—এক কাজ করি এস—আসতে আসতে নদীর ধারে যে মৌরীফুল দেখে এলাম এস আমরা তুজনে তাই পাতাই। কেমন?

সুশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহারা মৌরীফুল পাতাইল।

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন—বউমারা এদিকে এস।

তাহারা গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক - সেদিন পূজা দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রকাণ্ড বটগাছ, তাহার তলায় ভাঙা ইটের মন্দির। গাছতলা হইতে একটু দূরে এক বুড়ী নানা ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে শুরু করিয়া সকল রকমের ঔষধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর্য্যন্ত। মেয়েরা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ কিনিতেছে। সুশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল, বলিল—চলো মৌরীফুল, দেখি গে কেমন পূজো হচ্ছে।

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সুশীলা একটা ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঔষধ বেচা বুড়ির নিকট দাঁড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী বলিল—কি চাই।

সুশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

বুড়ী বলিল—আর বলতে হবে না মা-ঠাকরুণ। তা তোমার তো এখনো ছেলে-পিলে হবার বয়স যায়নি, ও বয়সে অনেকের—

সুশীলা সলজ্জভাবে বলিল—তা নয়।

বুড়ি বলিল—এবার বুঝলাম মা-ঠাকরুণ—তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বারমুখো টান আছে। একটা ওষুধ দিই, নিয়ে যাও, এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে—ও-রকম কত হয় মা-ঠাকরুণ ··

বুড়ি একটা শিকড় তুলিয়া বলিল—এই নাও বেটে খাইয়ে দিও। যেন কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল হবে না। আট আনা লাগবে।

স্বামীর বারমুখো টান আছে—একথা শুনিয়া সুশীলা খুব দমিয়া

গেল। তাহার আঁচলে একটা আধুলি বাঁধা ছিল, আজকার দিনে জিনিসটা-আসটা কিনিবার জন্যে সে ইহা বাড়ী হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিয়াছিল? বাড়ীর বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে একটা উৎসবের দিন। আধুলিটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিবার কারণ—মোক্ষদা ঠাকরুণ জানিতে পারিলে ইহা এতক্ষণ তাহার আঁচলে থাকিত না। সুশীলা আঁচল হইতে অধুলিটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে বাঁধিয়া লইল!

পুজা দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল। গ্রামের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে সুশীলা বলিল—ভাই তুমি এখন দিনকতক আছ তো।

—না ভাই, আমি কাল কি পরশু চলে যাব। তা হ'লেও তোমায় ভুলবো না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি আমার মনে থাকবে ভাই—চিঠিপত্র দেবে তো? এবার পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম—তোমায় কথনো ভুলবো না।

সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্ট, একগুঁয়ে, ঝগড়াটে।

তাহার হাতে একটা সোনার আংটি ছিল, ইহা তাহার মায়ের দেওয়া আংটি, বিবাহের পর প্রথম তাহার মা তাহার হাতে এটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল—দেখি ভাই তোমার আঙুল, তুমি হলে মৌরীফুল তোমায় খাওবার কথা, কাপড় দেওয়ার কথা—এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরীফুলকে ভুলে যাবে না।

সুশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে গেল, -বউটি চট করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল-দুর পাগল! না ভাই এ রাখো—তোমার মায়ের দেওয়া আংটি—এ কেন আমায় দিতে যাবে? না ভাই···।

সুশীলা জোর করিতে গেল—হোক ভাই, মায়ের দেওয়া বলেই···

বউটি বলিল—দূব ! না ভাই ও-সব রাখো—সে বরং

সুশীলা খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার হইয়া গেল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি সুশীলার হাত ধরিয়া বলিল—পায়ে পড়ি মৌরীফুল, রাগ কোরো না। আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি আমায় দিয়ে যাবে ভাই ? আচ্ছা, তুমি যদি দিতেই চাও এই পূজোর সময় আসবো—অন্য কিছু বরং দিও—একদিন না হয় খাইয়ো—আংটি কেন দেবে ভাই! —আর আমায় ভুলবে না তো—ভাই ?

সুশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল—তোমায় ভুলবো না ভাই মৌরীফুল ! কখখোনো না—তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল···

তাহার পরে সে একটু আনাড়ি ধরনে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ হিঃ। কেমন সুন্দর কথাটি মৌরীফুল—মৌরীফুল—মৌরীফুল—

তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল তোমায় কি ভুলতে পারি ?···

কথা শেষ না করিয়াই সে দুই হাতে গঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।

কলিকাতার বউ এই অদ্ভুত প্রকৃতির সঙ্গিনীর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানা বার বার সস্নেহে চুম্বন করিল—তারপর দুজনেই চোখের জলে ঝাপসাদৃষ্টি লইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল।

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটী নাই, কি-একটা কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে দু'একদিন রেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিনীর আহ্বানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য করিতে চৌধুরীবাড়ী চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—বউমা আমার ফেরবার কোনো ঠিক নাই, রান্না-বান্না করে রেখো, আমি আজ আর কিছু দেখতে পারবো

না, চৌধুরীবাড়ির কাজ—কখন মেটে বলা যায় না।

একথা মোক্ষদার না বলিলেও চলিত। কারণ ভোরে উঠিয়া বাসনমাজা, জলতোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল সুশীলার উপর। এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনো দিন ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই - যদিও পূর্ব্বে বাড়িতে বরাবরই একজন করিয়া ঝি-থাকিত। সুশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল—যখন মেজাজ ভালো থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না।

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্যান্য কাজকর্ম্ম সারিয়া সুশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, এ-কথা সুশীলা বহুবার শ্বশুরকে জানাইয়াছে। রামতনু মধ্যে মধ্যে মজুর ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেক দিন হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই, কিশোরীর দোষ নাই, কেন না সে বড় একটা বাড়িতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে রান্নাঘরের পিছনে খিড়কির বাহিরে অনেক শুকনা বাঁশ ও ডালপালা পড়িয়া আছে—সুশীলা রান্না চড়ানোর পূর্ব্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন মত এগুলি দা দিয়া কাটিয়া লইয়া কাজ চালাইত। রামতনু দেখিলেন, কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা—আনিলেই এখনই একটা টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক, কারণ বকুনিই উহার স্বভাব।

কাঠ নাই দেখিয়া সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল। এদিকে বাড়িতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের ঝাল মিটায়, কাজেই সে আপন মনে চীৎকার করিতে লাগিল—পারবো না, রোজ রোজ এমন করে সংসার করা আমায় দিয়ে হয়ে উঠবে না—আজ দু'মাস ধ'রে বলছি কাঠ নেই, কাঠ নেই—এদিকে রান্নার বেলা ঠিক আছেন সব, তার একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই—কি দিয়ে রাঁধবে? হাত

পা উনুনের মধ্যে দিয়ে রাঁধাব নাকি? রোজ রোজ কাঠ কাটো, কেটে রাঁধো—অত সুখে আর কাজ নেই—থাকলো হাঁড়ি পড়ে, যিনি যখন আসবেন, তিনি তখন ক'রে নেবেন···

রাঁধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল ততক্ষণ মশলাগুলো বাটিয়া রাখা যাক্। সে মাঝে মাঝে কাজের সুবিধার জন্য কয়েকদিনের মশলা একসঙ্গে বাটিয়া রাখিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে বউ, পরনে একখানা পুরানো চেলির কাপড়, হাতে থাকিবার মধ্যে দুগাছি শাঁখা —একটি বাটি হাতে রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া বলিল—দিদি আছ নাকি?

সুশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—আয় আয় ছোট বউ—আয় না ঘরের মধ্যে—ঠাকরুণ নেই ··।

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এ কি দিদি, এত বেলা হ'ল এখনও রান্না চড়াওনি যে!

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—রান্না চড়াব! হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙ্গে ফেলিনি এই কত!···

বউটির চোখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সে বলিল—না দিদি ও সব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও লক্ষ্মীটি, নইলে জান তো কি রকম লোক সব

—দেব—দেখবে সব আজ কি রকম মজা, রোজ রোজ কাঠ কাঠবো আর ভাত রাঁধবো, উঃ!

—কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি, আমি দিচ্ছি কেটে।

—তোর কি দায় তুই দিতে যাবি? বোস ঠাণ্ডা হয়ে—যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক গিয়ে···

—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে, জান তো ওরা ··

—তুই বোস দেখি ওখানে চুপ ক'রে, দেখিস এখন মজা—আজ ছ'মাস ধরে রোজ বলছি কাঠ নেই, কথা কানে যায় না কারুর—আজ মজাটি দেখাবো···

সুশীলার একগুঁয়েমিতে বউটি কিছু ভীতা হইল, কারণ মজা কোন্ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

এই বউটি রামতনু মুখুয্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন মুখুয্যের পুত্রবধূ। পাশেই এদের বাড়ি। রামলোচনের অবস্থা খুবই খারাপ —তা সত্ত্বেও তিনি বছর দুই হইল ছেলের বিবাহ দিয়েছেন। রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্রবধূই গৃহিনী। দুরবস্থার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে-অসময়ে বাটি হাতে খুঁটি হাতে এ বাড়িতে হাত পাতিয়া তেলটা নুনটা লইয়া যাইত, চাউল না থাকিলে আঁচলে করিয়া চাউল লইয়া যাইত—ধার বলিয়াই লইয়া যাইত—কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না।

মোক্ষদা ঠাক্রুণকে বউটি বড় ভয় করে—তিনি থাকিলে জিনিসপত্র দেনই না, যদি বা দেন তাহা বহু মিষ্ট বাক্যবাণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়, কি করিবে, অভাব। সুশীলা তাহাকে মোক্ষদা ঠাক্রুণের হাত হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা যখন যাহা দরকার সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্য একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁশিয়ার মোক্ষদা ঠাক্রুন তাহা কখনও ভুলিতেন না—গলা টিপিয়া কড়া-ক্রান্তিতে তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। সুশীলা ছিল অগোছালো ও অন্যমনস্ক-ধরনের মানুষ, সে ধার দিয়া অতশত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল নুন ধার দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না—শোধ দিতে আসিলে অনেক সময় বলিত—ওই তুই আবার দিতে এলি কেন ভাই ছোট বউ, ওর আবার নেব কি? যা, ও তুই নিয়ে যা ভাই।

সুশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে চাহিয়া বলিল

—তারপর, তোর রান্নাবান্না?

বউটি বাটিটা আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, বাহির করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—সেদিনকার সেই তেল নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও আনা হয়নি। আজ রাঁধবার তেল নেই—একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে যাবো—সেইজন্য···

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয়নি।

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সবটুকু এই কুণ্ঠিতা দরিদ্রা গৃহলক্ষ্মীটিকে ঢালিয়া দিল। বউটি চলিয়া যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে···

সুশীলা বলিল—তুই পালা দেখি—আমি ওদের মজা না দেখিয়ে আর আজ কিছুতেই ছাড়ছিনে···

বেলা বারোটার সময় মোক্ষদা ঠাক্‌রুণ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হইচই বাধাইয়া দিলেন। প্রকৃতই ইহাতে রাগ হইবার কথা। একটু পরে রামতনু আসিলেন, তিনি ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন মনে তামাক টানিতে শুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈঃস্বরে সুশীলার কুলজি গাহিতে লাগিলেন। —সুশীলাও যে খুব শান্তশিষ্ট, এ অপবাদ তাহাকে শত্রুতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার যখন খুব বাধিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া হাজির হইল—যদিও আজ তাহার ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে পাইয়া হাঁকডাক আরও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী এত বেলায় বাড়ি আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল—তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুকনো চেলাকাঠ পড়িয়াছিল, সেইটা লইয়াই লাফাইয়া সে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিল। সুশীলা তখনও বসিয়া বাট্‌না বাটিতেছিল—স্বামীকে শুকনা কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রান্নাঘরে লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ

শুকাইয়া গেল—আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত দুটো তুলিয়া নিজের দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা করিল—কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া এক হেঁচকা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তারপর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলাকাঠের বাড়ি মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল রান্নাঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা দিল একেবারে উঠানে। ধাক্কার বেগ সামলাইতে না পারিয়া সুশীলা মুখ থুবড়িয়া উঠানে পড়িয়া গেল —মার আরও চলিত, কিন্তু রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।

পাশের বাড়ির বউটি তখন শ্বশুর ও স্বামীকে খাওয়াইয়া সবে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ বাড়ীর মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া সুশীলাদের খিড়কিতে ছুটিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—সুশীলা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে; সর্ব্বাঙ্গে ধূলা, বাটনার পাত্রের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে হলুদের ছোপ; মাথার খোঁপা একধারে খুলিয়া কতক চুল মুখের উপর কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে; গাঙ্গুলী-বাড়ি হইতে দুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, আরও দু-একজন পাড়ার মেয়ে সামনের দরজা দিয়া উঁকি মারিতেছে—ওদিকে পাঁচিলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শ্বশুর রামলোচন মজা দেখিতেছেন।

চারিদিকের কৌতূহলদৃষ্টির মাঝখানে, সর্ব্বাঙ্গে হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা বিস্রস্তকুন্তলা, অপমানিতা দিদিকে অসহায় ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কি রকম করিয়া উঠিল—কিন্তু সে একে ছেলেমানুষ তাহাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা, শ্বশুর ভাসুর এবং একউঠান লোকের মধ্যে বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কির বাহিরে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঙ্গুলী বাড়ির প্রৌঢ় গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা হাতে—কি হে রামতনু, বলি ব্যাপারখানা কি শুনি—বলিয়া বাড়ির মধ্যের উঠানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সুশীলার হাত ধরিয়া খিড়কি-দোর দিয়া

বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন ও-রকম করতে গেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি তখনই যে বারণ করলাম ?…

তার পরদিন দুপুরবেলা সুশীলা রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাকরুণ কি প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুশীলা পিছনে ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। মোক্ষদার কি-রকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, তোমার বাটিতে কি ?—কি মেশাচ্ছ ডালের বাটিতে ?

সুশীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মোক্ষদার সন্দেহ আরও বাড়িল—তিনি বাটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ-মত কি একটা বাটা।

তিনি কড়াসুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বেটেছ এতে ?

তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা ঠাক্‌রুণ বাটি হাতে—ওমা কি সর্ব্বনাশ! আর একটু হ'লেই হয়েছিল গো,—বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া হাট বাধাইলেন।

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতনু আসিলেন, গাঙ্গুলীবাড়ির মেয়েপুরুষ আসিল, আরও অনেকে আসিল।

মোক্ষদা সকলের সামনে সেই বাটিটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন ছাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব শাশুড়ী-মাগী বড় দুষ্টু—নিজের চোখে দেখে নাও ব্যাপার, সর্ব্বনাশ হয়ে যেত এখনি, যদি আমি না দেখতাম—দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই আজ ঠেকিয়েছ…

একউঠান লোক—সকলেই শুনিল রামতনুর দুরন্ত পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়েছে। কেউ অবাক হইয়া গেল, কেউ মুচকি হাসিয়া বলিল—ও-সব আমরা

অনেককাল জানি, আমরা রীত দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে বলে এতদিন ··

কে একজন বলিল—জিনিসটা কি তা দেখা হয়েছে ?

মোক্ষদা ঠাক্‌রুণের গাল-বাদ্যের রবে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতনুকে বলিলেন—গুরু রক্ষা করেছেন। এখন যত শীগগির বিদেয় করতে পার তার চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভার্য্যে। আর একদিনও এখানে রেখো না।

সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ি ডাকিয়া আপদ বিদায় করা হইবে, আর একদিনও এখানে না, কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ পাড়ায় মধ্যে ও রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য অন্য বউ-ঝিও দেখাদেখি ঐরকম হইয়া উঠিবে।

সেদিন রাত্রে সুশীলাকে অন্য এক ঘরে শুইতে দেওয়া হইল—ইহা মোক্ষদা ঠাক্‌রুণের বন্দোবস্ত—কাল সকালেই যখন যেখানকার আপদ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের ?

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কত রাত পর্যন্ত তাহাব ঘুম আসিল না। ঘরের জানালা সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই দুই দিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে—সে স্বভাবত নির্ব্বোধ, লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্ব্বে কখনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্ব্বে বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ ও কালকার দিনের মত শ্বশুর-শাশুড়ী ও এক-উঠান লোকের সামনে এভাবে অপমানিতও সে কোনদিনই হয় নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল বাঁধ মানিতেছে না—কাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙিয়া হাতও ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই

স্বামী, যে স্বামী পাঁচছয় বৎসর পূর্ব্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল ?

পান খাওয়ানোর কথাটাই সুশীলার বার-বার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরও ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায় দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের শিমূলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া ঢলিয়া পড়ে ··পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ঝরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী · বসন্ত লক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাট্‌কা ফুলের ডালি সাজাইতেছে। ·

শুইয়া শুইয়া সুশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালবাসে না—কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে রোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্যই যদি কেউ তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল—আর ভালবাসে ওই ছোট-বউটা। আহা, ছোট বউ-এর বড় কষ্ট ? ভগবান দিন দিলে সে ছোট বউয়ের দুঃখ ঘুচাইবে।···কিন্তু স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে ? ও কিছু না, অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, নহিলে সেও কি এমন ছিল ? মৌরীফুলের বর তো কত জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকরি করিয়া দিতে পারে। চাকরি হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না, মাঠের ধারের ছোট ঘরখানি সে মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, উঠানে কুমড়ার মাচা বাঁধিবে, বাজার-খরচ কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছালো নয়, একবার

বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে সে গোছালো কিনা। আচ্ছা, ওই বাড়িখানায় যদি আগুন লাগে। না—আগুন দিবে কে? ছোটবউ, উঁহু, দিলে তাহার শাশুড়ী ঠাকৃরুণই দেবে, যে রকম লোক!

জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ও-গুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাত্রে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো?···তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজাইয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী ওরকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে···আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না কেন? লাল চৌকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া আতর না কি মাখান

পরদিন সকলবেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরি হইতে লাগিল দেখিয়া ঠাক্রুণ ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, পুত্রবধূ জ্বরের ঘোরে অঘোরে অচৈতন্য অবস্থার ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল।··

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার দিকে বিশেষ কেহ নজর করিল না, তার পরদিন বেগতিক বুঝিয়া রামতনু ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল —সত্যি মৌরীফুল তা নয়, ওরা যা বলছে·· আমি অন্য ভেবে···

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে মারা গেল।

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়া গেল, পাড়ার কাক চিলগুলাও একটু, সুস্থির হইল। কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে আসিল: দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্ম্মপটু, হুঁশিয়ার, গোছালো। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন পরেই যখন কিশোরী পালদের স্টেটে ভাল চাকরিটা পাইল, তখন নূতন ব:-এর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই খুব খুশি হইল।

সংসারের অলক্ষ্মীস্বরূপা আগের পক্ষের বউ-এর নাম সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে না।

জলসত্র

বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি-মশায় শিষ্যবাড়ি যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন, মাঠের চারিধারে কোনদিকে কোন সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না! এক-আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদপোড়া—কটা। ব্রাহ্মণের কাপড় চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠলো, আর গায়ে রাখা যায় না। এক-একটা আগুনের ঝলকের মত দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখে মুখে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরবেলা এ মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে, প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, এ-কথা নবাগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল তবুও তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধহয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিম দিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই কেবল চক্‌চকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগল। তৃষ্ণা এত বেশী হোল যে, সামনে ডোবায় পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান

দিয়ে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগলো; জিব জোর করে' চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মত শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে···চক্‌চকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে···মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘুর্ণী হাওয়া গরম বালি-ধুলো কুটো উড়িয়ে নাকে মুখে নিয়ে এসে ফেলছে।··· অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হতে লাগলো···একটু ঘন সবুজ মত যদি কোন পাতাও পাই তা হলে চুষি · জীবনে তিনি যত ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন তা' এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগলো। তাঁর বাড়ির পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা··· পাহাড়পুরের কাছারির ইঁদারার জল সে তো একেবারে বরফ···কবে তিনি শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিন, তারা তাঁকে বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে, নতুন কলসীর জল খেতে দিয়েছিল, সে একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কনকন করে। আচ্ছা, এখন যদি সেই রকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয়? ······তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের কলজে পর্যান্ত যেন শুকিয়ে উঠলো। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়লো তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই; আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হতে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল-তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির ওপর ছটফট করে' প্রাণ হারিয়েছে! ···সত্যিই তো। এখনও তো দু'ক্রোশ দূরে গ্রাম ···যদি তিনিও?

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ হাঁটার শেষে কোথাও যেন একঘটি ঠাণ্ডা কনকনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে। পথ হাঁটার বাজী জিতলে সেই ঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মতন চলছিলেন; আধক্রোশটাক পথ নলে-উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন,

বোধ হয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বটগাছ। গাছটার তলায় কোন পুকুর হয়তো থাকতে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে ?

বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র! চার পাঁচটা নূতন জালায় জল, এক পাশে একরাশি কচি ডাব! একধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ-ধামা বাতাসা! বাঁশের চেরা একটা খোলা কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এ মুখে অঞ্জলি পেতে জল পান করছে।

গাছতলায় যারা বসে ছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরমণিমহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুরমশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে ?

একজন বলল—আহা, সে কথা রাখো, বাবা-ঠাকুর আগে ঠাণ্ডা হোন।

শিরোমণিমশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছ, প্রায় দু'তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে·· ···একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বট পাতা ভেঙ্গে নিয়ে এল নল করবার জন্যে।··· ··আঃ কি ঝিরঝিরে হাওয়া! এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা, ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরী-তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেক কমে গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হোল। একজন বললে—ঠাকুর মশায়, হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। ভাল সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা সেবা করে একটু জল খান, এই রোদে এখন আর যাবেন না—বেলা পড়ুক।

এইবার, শিরোমণিমশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এ জলসত্র কাদের ?

—আজ্ঞে ঐ আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর

নিতাই বিশ্বেস নাম শুনেছেন?

শিরোমণি মশায় বললেন—বিশ্বেস? সদগোপ?

—আজ্ঞে না কলু।

সর্ব্বনাশ! নতুন মাটির জালা ভর্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত্ত শিরোমণিমশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর এক মুহূর্ত্তে কর্পূরের মত উবে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কি করে' জল খাবেন? তিনি নিজে এবং তার বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী; আজ কি তিনি—ওঃ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।—নইলে, এখনি তো......

শিরোমণিমশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া?

—তা আজ প্রায় পনের-ষোল বছর হবে। শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কি বলি শুনুন।—বলে, লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

আমডোবের তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট, চৌদ্দ-পনের বছর বয়স, তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন'-দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে কলা বেগুন কুমড়ো এইসব হাটে বিক্রি করতো; এতেই তাদের সংসার চলতো। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না—নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশী হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আসতে তারাচাঁদের ছোট বোনটা অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি ছোট বোনটি মাঠের মাঝামাঝি এসে বললে—দাদা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবো।

তারাচাঁদ তাকে বোঝাল, বললে—একটু আগিয়ে চল, রতনপুরের কৈবর্ত্ত পাড়ায় জল খাওয়াব।

সেই 'একটু আগিয়ে' মানে হু'ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়লো। বার বার বলতে লাগলো—ও দাদা, তোর ছুটি পায়ে পড়ি, দে আমায় একটু জল—

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বড়গাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেললে। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্ত্তপাড়া থেকে এক ঘটি জল চেয়ে এনে দেখে তার বোনটা গাছতলায় মরে পড়ে আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা। এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টায় যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে তার রস চুষেছিল - সেই থেকে এই মাঠটার নাম হোল কচু-চুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতো—দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্যে তুই একটা জলসত্র করে' দে।......তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছটার পিতিষ্ঠে করে জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনেরো ষোল কি বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুর-মশায়, কচু-চুষির মাঠের এ জলসত্র এদিকে সকলেই জানে। বলবো কি বাবাঠাকুর, এমনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টার বেঘোরে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক না কি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে—ওগো আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এস।...

লোকটা তার কাহিনী শেষ করলে; তারপর বললে—সত্যি-মিথ্যে জানিনে ঠাকুরমশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে...

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম করলে।

বেলা পড়ে এল। কতলোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগলো। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙ্গল ছেড়ে বটতলায় উঠলো। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে গল্প করতে লাগলো।

এক বুড়ী অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বললে—আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা ?

আবদুলের মা একগাল হেসে বললে—তা দ্যাও দিনি মোরে, আজ একটা খাই। মরবো তো খেয়েই মরি।

একজন লোক পরনে টাট্‌কা কোরা কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙ্গা ধপধপে সাদা টুইলের শার্ট, হাঁটু-পর্য্যন্ত কাপড়-তোলা পায়ে এক পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশ ভাবে ধপ করে বসে পড়লো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না ?

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে গেল এবং যে উকীলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হোত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যে আধসের আন্দাজ ভিজে-ছোলা উদরসাৎ করে একাছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ডাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদ রং-এর সোঁদাল ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো করে ছিল। একটা পাখী আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—বৌ কথা-ক'—বৌ কথা-ক'।

শিরোমণিমশায়ের বসে বসে মনে হোল, বিশ বছর আগে' তাঁর আট বছরের পাগলী মেয়ে উমার মতই ছোট একটি মেয়ে এই

বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল অভাবে বুনো কচুর ডাঁটার রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ-করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লী-প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত্ত পথিকদের আশ্রম তৈরী করেছে। ··এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ-মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল যোগাচ্ছে·· চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে···তপ্ত মাঠের পথ যখন ছায়া শীতল হয়ে আসে···তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র-আঁচল উড়িয়ে কোন অজ্ঞাত ঊর্দ্ধলোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে যায়! তায় পৃথিবীর বালিকাজীবনের ইতিহাস সে ভোলেনি।···

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণিমশায় তাকে বললেন—ওহে বাপু, তোমার ঐ বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে এক ঘটি জল আমায় দাও, আর ইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ আছে বললে না?

সমাপ্ত